প্রেম পরিণয় ইত্যাদি

বিমল মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭১

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও-গুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক ওই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠকবর্গকে প্রতারণা করছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

এই লেখকের এ-যাবৎ-লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

এর নাম সংসার
চার চোখের খেলা
সাহেব বিবি গোলাম
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক
একক দশক শতক (নাটক)
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
শ্রেষ্ঠ গল্প
সখী সমাচার
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
নফর সংকীর্তন
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
মন কেমন করে
অন্যরূপ
নিশিপালন
রাজা বদল
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
চলো কলকাতা
বেনারসী
কুমারী ব্রত
আমি
রাগ ভৈরব
আসামী হাজির
দু চোখের বালাই
পরস্ত্রী
যা হয়েছিল
মধ্যিখানে নদী
যে অঙ্ক মেলেনি
তিন নম্বর সাক্ষী
চলতে চলতে

কলকাতা থেকে বলছি
গল্পসম্ভার
গুলমোহর
রানী সাহেবা
কথাচরিত মানস
কাহিনী সপ্তক
এক রাজা ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
হাতে রইল তিন
দিনের পর দিন
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জন মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
পতি পরম গুরু
রং বদলায়
সুয়ো রানী
নবাবী আমল
নটনী
স্ত্রী
বিনিদ্র
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
যে যেমন
চাঁদের দাম এক পয়সা
ফুল ফুটুক
লজ্জাহরণ
পাঁচ কন্যার পাঁচালি
আমার প্রিয়
বাহার
বিষয় বিষ নয়
জন-গণ-মন

[এই তালিকা বহির্ভূত সমস্ত বই-ই জাল]

জন্ম-মৃত্যু-আশা-হতাশা-পাপ-পুণ্য-প্রেম-পরিণয় ইত্যাদি নিয়েই তো জীবন। অথচ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উপন্যাস-গল্প লিখেও এই জীবনের কণামাত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না। রহস্যই এর আকর্ষণ, আবার রহস্যই এর অশান্তি। এই রহস্য থাকবে, অথচ এই রহস্য উন্মোচনের জন্যে মানুষ তপস্যাও করে যাবে। মানুষের হয়তো এই-ই বিধিলিপি।

আদিযুগে মানুষ সূর্য-চন্দ্র-তারা আর এই প্রকৃতির দিকে চেয়ে চেয়ে প্রশ্ন করতো—তোমরা কারা?

প্রশ্ন করবার লোক ছিল। কিন্তু উত্তর দেবার কেউ ছিল না। হাজার হাজার মানুষ এই প্রশ্ন সমাধানের জন্যে হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গ করেছে, হাজার হাজার বই লিখে গেছে। তালপাতার পুঁথি ভর্তি করে রেখে গেছে তাদের প্রশ্নাবলি। কেউ বা উত্তর পেয়েছে, কেউ আবার পায়ওনি। উত্তর যা পেয়েছে তাও বেশির ভাগ সময়ে মন-গড়া। কিছু-কিছু আবার স্ব-কপোলকল্পিত। নিজের নিজের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে তারা নিজের নিজের উপলব্ধির কথা লিখে গেছে। সুদূর অতীত কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর চলে আসছে। একই উত্তরের বিভিন্ন রকম-ফের। কারো বাণীই পূর্ণ সত্য নয়, আবার কারো বাণীই পূর্ণ মিথ্যে নয়। কেউ বলেছে—আমি তাঁকে জেনেছি। আবার কেউ বলেছে—আমি তাঁকে জানতে পারিনি। কেউ বলেছে—তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। আবার কেউ বলেছে—তিনি স্পষ্ট, তিনি প্রত্যক্ষ, তিনি মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ঈশ্বর মানুষ হয়েছিলেন, আবার মানুষ ঈশ্বর হবে।

কিন্তু এ তো তত্ত্ব। তত্ত্বকথায় মনের তৃপ্তি হয় না। জলজ্যান্ত সত্য কথা প্রত্যক্ষ করতে চায় সাধারণ মানুষ। তারা বলে—মানুষের জীবনের কাহিনী শোনাও। আমাদের মত যাদের জন্ম-মৃত্যু-আশা-হতাশা-পাপ-পুণ্য-প্রেম-পরিণয় ইত্যাদি আছে, সেই সব মানুষের কথা বলো, শুনি। আমাদের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে তাদের জীবন-কাহিনী মিলিয়ে নিই। মিলিয়ে নিয়ে বিচার করে দেখি তাদের চেয়ে আমরা আলাদা কি না। যদি আলাদাই হই তো কতখানি আলাদা। যদি একরকমই হই তো কতখানি এক। দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের কতটা বৈসাদৃশ্য, আর কতটাই বা সাদৃশ্য। তাদের দুঃখে আমাদের দুঃখ লাঘব হবে, তাদের সুখে আমরা বাঁচবার আশা পাবো!

কিন্তু বিধাতা-পুরুষের তো কাজ নয় আশা দেওয়া। যেদিন থেকে সৃষ্টির শুরু সেদিন থেকেই যে তিনি দুঃখে মুহ্যমান, মানুষ দুঃখ পায় বলেই তো মানুষের ঈশ্বর করুণাময়। তাঁর ভালবাসার বেদনা ভাগ করে ভোগ করতেই মানুষের সৃষ্টি।

প্রথমে প্রেমের কথাই ধরা যাক।

এ-প্রেম আজকের যুগের প্রেম নয়। এ তখনকার প্রেম যখন এই আমরা কেউই এখানে এই বাঙলা দেশে ছিলাম না। আমাদের তখন জন্মই হয়নি। কিন্তু বাঙলা দেশ ছিল। এই গাছ-পাহাড়-নদী-আকাশ-বাতাস-সূর্য-চন্দ্র জন্ম-মৃত্যু-আশা-হতাশা-পাপ-পুণ্য-প্রেম-পরিণয় ইত্যাদি সবই ছিল। ছিল ঠিক এই রকমই, যেমন আছে এখন। তখনও মানুষ ভালোবাসতো, হাসতো, কাঁদতো, সংসার করতো।

এ সেই দু'শো বছর আগেকার প্রেমের কাহিনী।

যখন 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখি তখন এই গুলজারি বাঈ-এর কাহিনীটা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ও-কাহিনীটাও কোথাও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো।

নবাবী খানদানি আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন রীতি-প্রকৃতি কয়েক

বছর ধরে খুব পড়াশোনা করতে হয়েছিল। বলতে গেলে ওই বইটা লেখবার সময়ে মুসলমানি সংস্কৃতির মধ্যে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। গল্পটার জন্যে নয়। গল্পটা তো উপলক্ষ্য মাত্র। আসল হচ্ছে সেই যুগ। বই পড়তে পড়তে যদি সেই যুগের আবহাওয়ার মধ্যে না ডুবে যেতে পারি তো সে বই পড়েও লাভ নেই, লিখেও লাভ নেই।

সেই সময়েই এই গুলজারি বাঈ-এর ঘটনাটার কথা জানতে পারি।

কলেট সাহেব যখন কাশিমবাজারে এসেছিল তখনও জানতো না গুলজারি বাঈ-এর কথা। 'তারিখ্-ই-বাঙলা' নামে যে ফারসী বই আছে তাতে সব কথা লেখা আছে, কিন্তু গুলজারি বাঈ-এর নামের উল্লেখ নেই। রিয়াজউস-সালাতিনেও নেই। গোলাম হোসেনও অন্য সব কথা লিখে গেছেন, কিন্তু গুলজারি বাঈ-এর কথা লিখে যাননি।

কলেট সাহেব কাশিমবাজার কুঠির কর্তা।

ক্যাপটেন ড্রেক সাহেব যখন মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতো তখন কলেটকে গিয়ে মুর্শিদাবাদের সব রিপোর্ট দিতে হতো।

নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর আরো বেশি করে ডাক পড়তো কলেটের।

ড্রেক জিজ্ঞেস করতো—মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী কলেট ?

কলেট বলতো—হাল-চাল ভালো নয়, ওমরাওরা বোধহয় রিভোল্ট্ করবে এবার।

—কীসে বুঝলে তুমি রিভোল্ট্ করবে ?

কলেট বলতো—সবাই আমাদের কাছে এসে তাই তো বলছে—

—সবাই মানে কে ? কারা ?

কলেট বলতো—যারা নবাবের আশেপাশে ঘোরে, তারাই বলছে।

—কী বলছে তাই বলো ?

কলেট বলতো—ইয়ার-লুৎফ্ খাঁ, একজন বড় দশ-হাজারি মনসবদার। সে আমাদের দলে আসতে চায়—

—আর কে ?

—মহতাপচাঁদ জগৎশেঠ! নবাবের ব্যাঙ্কার। তারপর আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষনচন্দর—

মাঝে মাঝে এই রকম সব খবর নিয়ে আসতো কলেট। কলকাতায় এলেই কলেট বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতো। খানা-পিনা করতো।

কাশিমবাজার আর কলকাতায় অনেক তফাত। কলকাতায় এলেই নানা ফূর্তিতে দিন কাটতো কলেটের। ইংরেজদের বড় পেয়ারের বন্ধু ছিল উমিচাঁদ। লোকটা দিল্‌দার মেজাজের। বাড়িতে দিন-রাত এলাহি রান্না চলছে। মোগ্‌লাই-খানা, ইংরেজী-খানা, হিন্দু-খানা। সব রকম খানা রান্নার বন্দোবস্ত আছে উমিচাঁদের বাড়িতে।

কলেট সেখানেও হাজির হতো।

—কী খবর সাহেব ? মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী ?

উমিচাঁদের বাড়িতে যদি কোম্পানীর কোনও সাহেব আসতো তো লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতো। মুর্শিদাবাদের নবাবের বন্ধু উমিচাঁদ। শেষকালে নবাব জানতে পারলে উমিচাঁদ সাহেবেরও বিপদ, কোম্পানীরও বিপদ।

তা এখানেই আলাপ হয়েছিল ছাব্বিশ বছরের ছেলে ক্যাম্পবেল সাহেবের সঙ্গে—

জন ক্যাম্পবেল!

এই গল্পের নায়ক।

কবে একদিন কী উদ্দেশ্য নিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিল কে জানে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—একে কোত্থেকে যোগাড় করলে উমিচাঁদ সাহেব! কোম্পানীর লোক তো এ নয়—

ক্যাম্পবেল হাসতে লাগলো মিটিমিটি।

বললে—আমি ডাক্তার—

উমিচাঁদ বললে—আমার পায়ে বাত হয়েছিল, ক্যাম্পবেল এক দাওয়াই দিয়ে সব সারিয়ে দিয়েছে, আমার বাত বিলকুল সেরে গেছে—

—কোত্থেকে ডাক্তারি শিখলে তুমি? লন্ডন্ থেকে?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি লন্ডনে কখনও যাইনি। পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি, কেবল জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছি—

—তাহলে ডাক্তারিটা শিখলে কোথায়?

ক্যাম্পবেল বললে—লাহোরে। একদিন জাহাজে উঠে পড়েছিলুম ইংলণ্ডের একটা পোর্ট থেকে, তারপরে জাহাজ যেখানে যায়। কিন্তু জাহাজটা আট মাস পরে ইণ্ডিয়ায় এসে ভিড়লো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় এলুম। এসেই একেবারে দিল্লি। দিল্লি থেকে লাহোর। সেখানে এক হেকিমের সঙ্গে কিছুদিন ছিলুম—

সত্যিই সেই হেকিমের সঙ্গে থাকতে থাকতেই সে দেখতে লাগলো কী করে সে দাওয়াই বানায়। ক্যাম্পবেল হেকিমের কথামত হামানদিস্তেতে হরতুকি কোটে, বড়ি বানায়। ওষুধগুলো আবার রোদে দেয়, তারপর সেগুলো পাথরের জারের ভেতরে পুরে রাখে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—তুমি পারা-রোগ সারাতে পারো?

ক্যাম্পবেল বললে—পারা-রোগ সারাতে না পারলে কি হেকিমি করা চলে? নবাব-বাদশা-ওমরাওদের তো পারা-রোগই হয়। পারা-রোগ হয়, গর্মিরোগ হয়, সুজাক্ হয়, মালেখুল্লিয়া দিমাগী হয়। কত রকম রোগ হয় নবাব-বাদশাদের—

—মালেখুল্লিয়া দিমাগী কাকে বলে?

ক্যাম্পবেল বললে—ওই আমাদের ইউরোপের সিফিলিসের মত—

—তা তুমি কাশিমবাজারে যাবে? সেখানে আমাদের কোম্পানীর হাউস্ আছে। যাকে ইণ্ডিয়াতে বলে কুঠি।

ক্যাম্পবেল হাসলো।

বললে—ইণ্ডিয়ায় যখন একবার এসে পড়েছি তখন যেখানে বলবে

সেখানে যাবো। জাহান্নমে যেতে বললে সেখানেও যাবো। আমি নরকেও যেতে তৈরি—

তা তা-ই হলো।

উমিচাঁদ বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও সাহেব। যখন দরকার পড়বে আমাকে খবর দিও। আমার দরজা তোমার জন্যে খোলা পড়ে রইলো। আমি থাকি আর না-থাকি তুমি এখানে এসে উঠবে, থাকবে, খাবে, কেউ কিছু আপত্তি করবে না—

উমিচাঁদের চাকর জগমোহনকেও সেইরকম হুকুম হয়ে গেল।

কলেট সেবার অন্যবারের মত একলা ফিরলো না কাশিমবাজারে, সঙ্গে নিয়ে এল এক পাগলা-সাহেবকে।

তা পাগলা-সাহেবই বটে।

ক্যাম্পবেল সাহেবের কোনও লাজ-লজ্জার বালাই নেই। গরমের দেশ, ঘামের দেশ বাঙলা দেশ। একটা প্যাণ্ট্ পরে খালি-গায়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় টো-টো করে। চাষাভুষোদের সঙ্গে বিড়ি খায়, তামাক খায়। হুঁকো নিয়ে কলকেয় টান দেয়। চাষীদের বাড়ি গিয়ে পান্তাভাত গেলে কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে।

আর কারো রোগ-টোগ করলে ওষুধ দেয়। বাতের ওষুধ, হাজার ওষুধ, খুশ্‌কির ওষুধ।

টাকা-পয়সার চাহিদা নেই। পাওনার কথা মুখে আনে না। সেরে গেলে সাহেবের আনন্দ। ওষুধে কাজ দিয়েছে।

কলেট মাঝে মাঝে দফতরে কাজ করতে করতে সাবধান করে দেয়।

বলে—এ সব কী বেলেল্লাগিরি করছো বেল্?

বেল্ বলে—কেন? আমি তো হেকিমি করি—

কলেট বলে—কিন্তু ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি করছো কেন?

ওরা হলো গিয়ে রাজা-বাদশার জাত, আর আমরা হলুম বেনে। ওদের মধ্যে অনেক স্পাই ঘুরে বেড়ায়, তা জানো?

—স্পাই?

—হ্যাঁ স্পাই। নবাব আমাদের সন্দেহ করে। নবাব জানতে পেরেছে যে আমরা কলকাতায় ফোর্ট বসিয়েছি। কেল্লা বানানো তো ক্রাইম। আমরা ট্রেড্ করতে এসেছি কিন্তু ওরা মনে করে আমরা এম্পায়ার বসাতে চাই এখানে—

বেল্ বললে—কিন্তু আমি কে? আমি তো কোম্পানীর কেউ নই—আমি তো ডাক্তার, যার অসুখ হয় তার রোগ সারাই—

সত্যিই রোগ সারানো একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পবেলের। তামাক খেয়ে যদি কেউ কাশতো তো সাহেব একটা বড়ি বার করে দিতো।

বলতো—খাও, বড়িটা খেয়ে নাও, কাশি বেমালুম সেরে যাবে—

শুধু কাশি নয়, মেয়েদের বাধক, সূতিকা, সে-সব রোগের অব্যর্থ দাওয়াই দিতো সাহেব। কুঠির সাহেবরাও নিশ্চিন্ত। রোগভোগের জন্যে আর ইণ্ডিয়ান-কোয়াক্দের দরজায় ধরনা দিতে হবে না।

কলেট বললে—তুমি ওদের সঙ্গে মেশো বেল্, কিন্তু দেখো যেন ইংরেজদের ইজ্জত থাকে—

তা অনেক বই ঘেঁটেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে অমন অদ্ভুত চরিত্রের ইংরেজ আর একটাও খুঁজে পাইনি। চেহারা নয় তো, যেন এ্যাপোলো। ফরসা টুক্-টুক্ করছে গায়ের রং, তার ওপর গায়ে-গলায়-বুকে-পিঠে একটাও ঘামাচি নেই। এটা বড় দেখা যায় না।

—তোমার গায়ে ঘামাচি হয় না কেন, বেল্?

বেল্ বলতো—আমি যে রাত্তিরে গায়ে আমার হেকিমি দাওয়াই মেখে শুই—

তারপর থেকে কুঠির সবাই হেকিমি-দাওয়াই মেখে বিছানায় শুতে

লাগলো। আর কারোর গায়ে ঘামাচি হয় না। বেশ তেলতেলা গা হয়ে গেল সকলের। তেল মেখে শুলে বেঙ্গলের মশাও আর কামড়ায় না।

গাঁয়ের চাষাভুষো লোকেরাও ভিড় করতে লাগলো কুঠি-বাড়িতে। এতদিন মশার উপদ্রবে সবাই ছটফট করেছে। জ্বর-জারি হয়েছে।

সবাই বলে—আমাকেও একটু তেল দাও সাহেব, মশার তেল—

বলতে গেলে কাশিমবাজার গাঁ থেকেই রোগ-ভোগ সব দূর হয়ে গেল। সাহেব রোগ সারায়, দাওয়াই দেয়, কিন্তু টাকা-পয়সা নেয় না।

কিন্তু লোকগুলো তা বলে নেমকহারাম নয়। মিনি-মাগনায় দাওয়াই নিতে তাদের বাধে। তারা ওষুধের বদলে অন্য জিনিস ভেট দিয়ে যায়। কেউ আনে একজোড়া মুরগী, কেউ গাছের বেগুন, পুকুরের মাছ। কেউ নতুন গুড়ের পাটালি। কেউ আবার নতুন গামছা এনে দেয়। নিজের তাঁতের হাতে বোনা গামছা, তাঁতের ধুতি, মিহি পাতলা থান।

ক্যাম্পবেল বললে—এ তো আজব দেশ ভাই, আমি লাহোর গেছি, দিল্লি গেছি, সব জায়গায় গেছি, কিন্তু বেঙ্গলের লোকদের মত মাই-ডিয়ার মানুষ তো কোথাও দেখিনি!

তারপর ক্যাম্পবেল বললে—ঠিক আছে ভাই, আমি এখানেই সেটেল্ করে গেলুম, এখান থেকে আর আমি নড়ছি না। এত ফুড্, এত খাতির, এমন ক্লাইমেট কোথাও নেই, এই-ই আমার হোম্, এই আমার হোম-ল্যাণ্ড—লং লিভ্ বেঙ্গল—

কিন্তু যারা ইতিহাস পড়েছে তারাই জানে এ সুখের দিন কপালে বেশিদিন সহ্য হলো না ইংরেজদের। ইংরেজদের সহ্য হলো না, তার কারণ আলাদা। তার জন্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস দায়ী।

কিন্তু ক্যাম্পবেলের কেন সহ্য হলো না, সেইটেই এ-উপন্যাসের কাহিনী।

আসলে 'গুলজারি বাঈ'-এর কাহিনী যারা পড়বে, তাদের পক্ষে এই ক্যাম্পবেল সাহেবের চরিত্রটা বোঝা দরকার।

যাদের পেছুটান বলে কিছু নেই, তারাই কেবল বিদেশ-বিভূঁইকে নিজের দেশ বলে মনে করে নিতে পারে।

আর নিজের দেশ না মনে করে নিতে পারলে কেউ ইংরেজ হয়ে খেজুর-গাছে চড়ে বাঙালীদের মত খেজুর-রস খেতে পারে?

আহা, ক্যাম্পবেল সাহেব খেজুর-রস খেতে বড় ভালোবাসতো।

সাহেব বলতো—যদি দেশে ফিরে যাই তো এই খেজুর-গাছের একটা চারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ফ্রেণ্ড্দের এই রস খাওয়াবো—

কত সব বন্ধু পাতিয়েছিল!

ইয়াসিন ছিল সাহেবের প্রাণের ইয়ার। ইয়াসিন খাঁ।

বলতো—ইয়াসিন, তুই আমার ডিয়ারেস্ট্ ফ্রেন্ড্ মাইরি, একটু খেজুর-রস খাওয়া—

শেষকালে হুপুরবেলায় খেজুর-রসটাই বেশি পছন্দ করতো ক্যাম্পবেল সাহেব। সেই রসে একটু নেশার মত হয় বেশ। তার সঙ্গে একটু হেকিমি দাওয়াই মিশিয়ে দিলে একেবারে ভড্কা।

কাশিমবাজার কুঠির সবাই সেই ভড্কা খাওয়া শুরু করে দিলে তারপর থেকে। ওদিকে ইংরেজদের কারবারও তখন রমারম। সোরার কারবার, নুনের কারবার, তাঁতের কাপড়ের কারবার। কোম্পানীর আয় হচ্ছে খুব। প্রজারা এজেন্সির কমিশন হিসেবে মোটা-মোটা টাকা লুটছে।

সেই সঙ্গে ক্যাম্পবেলের নামও ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

রোগ কার না আছে! শুধু ডাক্তারেরই অভাব। আর যা-ও বা হু'চার জন আছে তারা হাতুড়ে গো-বদ্যি। তাদের দিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো যায়; কিন্তু রোগ তাড়ানো যায় না।

সেই সময়েই হঠাৎ নবাব-দরবার থেকে লোক এল কাশিমবাজার কুঠিতে।

—তুমি কে ?

—আমি মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারের মীর মুন্সী। এখানে হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দিতে এসেছি।

—নবাব-দরবারের খৎ আছে ?

মীর মুন্সী জামার জেব্ থেকে সরকারী সীল-মোহর করা চিঠি বার করে দিলে।

কলেট সাহেব চিঠি পড়ে দেখলে তাতে লেখা আছে—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেব বরাবরেষু—

মোদ্দা কথা তাতে এই লেখা ছিল যে, চেহেল-সুতুনে গুলজারি বাঈ-এর বেমার হইয়াছে। হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তিনি যেন চেহেল-সুতুনে আসিয়া গুলজারি বাঈকে দেখিয়া দাওয়াই দিয়া যান। তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ তাঁহাকে তাঁর ন্যায্য স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক। ইতি···

ইয়াসিন খাঁ ক্যাম্পবেলের ইয়ার। খবরটা শুনে বললে—তোর বরাত ফিরে গেল ইয়ার—

ক্যাম্পবেল বললে—কেন ?

ইয়াসিন বললে—অনেক মোহর পেয়ে যাবি, গুলজারি বাঈ ভালো হয়ে গেলে ইনামও পাবি, চাই কি, নবাবের নজরে পড়ে গেলে সরকারি হেকিমি নোকরিও মিলে যেতে পারে। নবাবের পেয়ারের দোস্ত হয়ে যাবি, তখন কি আর আমাদের ইয়াদ থাকবে ?

ক্যাম্পবেল বললে—আর দূর, মোহর পেলে, নোকরি পেলে কি আমি শাহন্‌শা বাদশা হয়ে যাবো ? আমার এই ভাল, এই তোদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াই আর ফুর্তি করি—

কিন্তু ক্যাম্পবেল তো জানতো না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবে বলেই সে দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এই এখানে

এসে হাজির হয়েছিল। এই বেঙ্গলে।

বেঙ্গল তখন রাজনীতির ষড়যন্ত্রের হট্-বেড্ হয়ে আছে। এক কথায় বাঙলা ভাষায় যাকে বলে বারুদখানা।

শুধু একটা দেশলাই-কাঠির তোয়াক্কা।

একটা দেশলাই-কাঠি জ্বাললেই সমস্ত বেঙ্গল ফেটে গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যাবে।

তখনও খবরটা কানে যায়নি ক্যাম্পবেলের। সে মাঠ-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়াসিন তাকে নিয়ে বনে-জঙ্গলে গাছ-গাছড়া দেখিয়ে বেড়ায়। কোন্ গাছের পাতার কী গুণ, কোন্ গাছের শেকড়ের কী কার্যকারিতা তা সে চিনতে চেষ্টা করে। চিবিয়ে চিবিয়ে পরখ করে।

হঠাৎ সেদিন কুঠি-বাড়িতে এসে শুনলে খবরটা।

কলেট বললে—যাও, নবাব-হারেমের ভেতরে গিয়ে বাঈ-সাহেবাকে দেখে এসো—

ক্যাম্পবেল বললে—কিন্তু বেগম-সাহেবারা কি আমার সামনে বেরোবে?

কলেট বললে—না বেরোয় না বেরোবে, তোমার কী? তুমি মেডিসিন দিয়ে খালাস—

তা তাই-ই ঠিক হলো। ক্যাম্পবেল খবর পাঠিয়ে দিলে—সে যাবে—

চেহেল-সুতুন বড় অদ্ভুত জায়গা। কবে একদিন নবাব সুজাউদ্দীন এই প্রাসাদ তৈরি করে গিয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পরে। সে-কথা তখন লোকে ভুলে গিয়েছে। নবাব সুজাউদ্দীন গেছে, নবাব সরফরাজ খাঁ গেছে, নবাব আলিবর্দী খাঁও গেছে।

কিন্তু চেহেল-সুতুন তার গৌরব নিয়ে তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সকাল-সন্ধ্যেয় সেই প্রাসাদের মাথায় নহবত বাজে আর মুর্শিদাবাদের লোক বুঝতে পারে ক'টা বেজেছে। দূর থেকে যে-চাষা মাঠে-ক্ষেতে-খামারে কাজ করে সেও সন্ধ্যেবেলার নহবত শুনলে বুঝতে পারে এবার ঘরে ফিরতে হবে।

তারপর আর একবার বাজে রাত দশটার সময়।

তখন মুর্শিদাবাদের রাস্তার লোকজন সব ঘরে ফিরে গেছে। চারদিক ফাঁকা। চক্‌-বাজারে যারা বেলফুল বিক্রি করে বেড়ায় তারাও তখন আর নেই।

যে-গণৎকারটা সন্ধ্যেবেলা মাটির ওপর ছক কেটে মানুষের ভাগ্য-গণনা করতে বসেছিল, সেও পাততাড়ি গুটিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

তারই মধ্যে মাঝে মাঝে হয়তো কোতোয়ালীর লোক পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এদিকে-ওদিকে। কোথাও কোনও চোর-ডাকাত কারো বাড়িতে সিঁধ কাটছে কিনা তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

আর তার সঙ্গে আছে চর। চরের উপদ্রব।

মুর্শিদাবাদের শহরের আনাচে-কানাচে চরদের উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে নবাব আলিবর্দীর আমলের পর থেকেই। চারদিকেই হুঁশিয়ারি জানানো হয়ে গেছে—খুব সজাগ থেকো। টুপীওয়ালাদের চর আজকাল বড় ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে নবাব-দরবারের আমীর-ওমরাওদের বাড়ির ধারে-কাছে। তারা ইনাম দিতে আরম্ভ করেছে ওমরাওদের। তারা আশরফি ছড়াতে আরম্ভ করেছে সেখানে।

বিশেষ করে মহিমাপুরের দিকটাতেই বেশি নজর রাখে তারা। একটা তাঞ্জাম গেলেই হাঁক দেয়।

চিৎকার করে বলে—কৌন্‌ হ্যায় ?

ওধার থেকে তাঞ্জামওয়ালাদের উত্তর আসে—জগৎশেঠজীর আওরতবিবির—

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ছাড় হয়ে যায়।—যাও।

সেদিন বিকেলবেলাই অমনি একটা তাঞ্জাম এসে থামলো চেহেল-সুতুনের সামনে।

পাহারাদার ফৌজী-সেপাই চেহেল-সুতুনের সামনে পাহারা দিচ্ছিল ঘোড়ার ওপর বসে। তাঞ্জামটা সিং-দরজায় আসতেই হাঁকলো —কৌন্ হ্যায়?

তাঞ্জামওয়ালা হাঁকলো—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহাব—

—পাঞ্জা আছে?

—জী হুজুর!

তাঞ্জামওয়ালা পাঞ্জা বার করে দেখালে।

ফৌজী-সেপাই সেখানা পরখ করে দেখে ছাড় করে দিলে।

—যাও!

আর সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেটখানা ফাঁক হয়ে গেল। তারপর তাঞ্জামওয়ালারা হেকিম সাহাবকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

পশ্চিমের যে মেঘখানাকে প্রথমে তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেখানা যে এমন করে সমস্ত ভারতবর্ষটা গ্রাস করে ফেলবে তা নবাব আলিবর্দী খাঁ আভাসে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন নাতিকে।

নাতি নবাব মীর্জা মহম্মদ।

নবাব বলেছিলেন—টুপীওয়ালারা বড় সর্বনেশে লোক, ওরা এখেনে একবার যখন কারবার করবার সনদ নিয়েছে তখন শুধু কারবার করে চুপ থাকবে না—

তিনি বুঝিয়েছিলেন—কারবার মানেই রাজ্য-অধিকার। দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে ভাল করে ব্যবসাও করা যায় না। ব্যবসা করতে গেলেও রাজ্যের ওপর রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা দরকার হয়ে পড়ে। সেই হস্তক্ষেপ ওরা করবে।

মীর্জার মা তখন পুরোদমে ইংরেজদের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করে দিয়েছে, বেশ মোটা লাভ হচ্ছে সোরার ব্যবসায়। আমিনা বেগমের টাকা, আর ব্যবসা করে উমিচাঁদ। ইংরেজরা সোরা কেনে উমিচাঁদের কাছ থেকে। মোটা লাভ পায় নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলার মা আমিনা বেগম।

কিন্তু নবাব আলিবর্দীর বিধবা বেগম তখন কোরাণ আর মসজিদ নিয়েই আছে।

মেয়ে ব্যবসা করে ইংরেজদের সঙ্গে সেটা পছন্দ হয় না নানীবেগমের।

বলে—কাজটা ভাল নয় রে, মীর্জা চায় না যে তুই ওই ইংরেজ-টুপীওয়ালাদের সঙ্গে লেন-দেন করিস—ও যা চায় না তা তুই করিস কেন?

কিন্তু মেয়ে শোনে না।

বলে—কিন্তু টাকা? টাকা না থাকলে কেউ আমাকে খাতির করবে?

—এত টাকা তোর কীসের দরকার শুনি? বিধবা মানুষ তুই, তোর টাকার দরকার কীসের? কত টাকা তোর চাই বল না, আমি দিচ্ছি—

—আমি তোমার টাকা নেবো কেন বলো তো?

—তাহলে মীর্জার টাকা নে। মীর্জা তো তোর ছেলে। ছেলের টাকা নিতে তো তোর আপত্তি নেই!

আমিনা রেগে যেতো। বলতো—ছেলে? ছেলের কথা বলছো? ছেলে কি আমার?

—ওমা, বলিস কী তুই? ছেলে তোর নয় তো কার শুনি?

—ও ছেলে তোমার। ছোটবেলা থেকে ওকে তো তুমি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছো, ও তোমার আর বাবার আদর পেয়ে পেয়ে তোমারই ছেলে হয়ে গিয়েছে। আমি শুধু নামে-ওর মা—

নানীবেগম বলতো—এও আমার কপালে লেখা ছিল রে—

বলে আঁচলে চোখ মুছতো নানীবেগম।

এ-সব চেহেল-সুতুনের ভেতরের কথা। এ কেউ জানতো না। বাইরে থেকে লোকে জানতো চেহেল-সুতুনের ভেতরে বেগমের রাশ। সেখানে শুধু মজা আর ফুর্তি। বাঁদীরা আছে, খোজারা আছে, সরাব, রূপ, রূপো আর জীবন-যৌবনের জোয়ার আছে। বাইরে থেকে লোকে বলতো—চেহেল-সুতুন ফুর্তির জায়গা। নবাব রাজ্য চালায় না, নবাব কিছু দেখে না। শুধু সুন্দরী-সুন্দরী বেগম নিয়ে তামাসা আর ফুর্তি করে।

তা কথাটা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়।

ইংরেজ-কুঠিতেও সবাই তাই বলতো। বলতো—ইণ্ডিয়ার নবাবরা গোলাপ জলে চান করে, বেগমেরা গাধার দুধ দিয়ে গা পরিষ্কার করে। সে দুধে নাকি চামড়া নরম থাকে। ভেতরে যে-সব সুন্দরী থাকে তারা কখনও সূর্য দেখতে পায় না। সোনা-হীরে আর মুক্তো দিয়ে মোড়া তাদের গা। তারা যখন চলে তখন ময়ূরের মত নাচে। তাদের জন্যে যে-সব বাঁদী থাকে তারাও নাকি অপূর্বসুন্দরী। তাদের সঙ্গেও বাইরের লোকে দেখা করতে পারে না। পুরুষ-মানুষ যদি কেউ ভেতরে যেতে পারে তো সে শুধু খোজারা, যাদের পৌরুষ বলে কিছু নেই।

কর্নেট সাহেবও তাই বুঝিয়ে দিয়েছিল ক্যাম্পবেলকে।

ক্যাম্পবেল জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে রোগীকে পরীক্ষা করবো কী করে?

কর্লেট বলেছিল—আড়াল থেকে—

—আড়াল থেকে কখনও রোগী দেখা যায়?

—দেখা না গেলেও দেখতে হবে। সেইটেই যে কানুন।

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে আমার দ্বারা রুগী দেখা হবে না—

কর্লেট বলেছিল—না না—ও-কাজ করো না, যাও, আমাদের

হেড-কোয়ার্টার থেকে অর্ডার এসেছে নবাবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশ করতে হবে। সেইজন্যেই তো তুমি যখন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মেশে,, আমি তোমাকে এন্‌কারেজ করি—

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে কি স্পাইং করতে যাবো আমি ?

কলেট বলেছিল—একরকম তাই—স্পাইং করতে দোষ কী? আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, ব্যবসার সুবিধের জন্যে দরকার হলে স্পাইংও করবো।—ওরাও তো আমাদের পেছনে স্পাই লাগিয়েছে—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—ওই যে ইয়াসিন, তোমার ফ্রেণ্ড ও যে স্পাই নয় তা তোমায় কে বললে ?

চমকে উঠেছিল ক্যাম্পবেল কথাটা শুনে।

বলেছিল—না না, ওটা বাজে কথা। কখনও স্পাই হতে পারে না—

কলেট বলেছিল—পলিটিক্সস্‌-এ সবই সম্ভব বেল্‌, সবই পসিব্‌ল্‌।

কথাটা শুনে ক্যাম্পবেলের মনে বড় ধাক্কা লেগেছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। ডাক্তারি করে লোকের রোগ সারিয়ে আনন্দ পায় ক্যাম্পবেল, তার মধ্যে এত মতলব থাকতে পারে, তা সে ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু সে-সম্বন্ধে ইয়াসিনকে কিছু বলেনি। চোদ্দ বছর বয়সে ইণ্ডিয়াতে এসেছিল সাহেব, তারপরে অনেকদিন কেটে গেল, এখনও ইণ্ডিয়াকে ভাল করে চিনতেও পারলে না। কোথায় সেই লাহোর, কোথায় সেই দিল্লি, আর কোথায় এই কাশিমবাজার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরে-ঘরে তখন রোশনাই জ্বলে উঠেছে চেহেল-সুতুনে। বেগমদের ঘরে ঘরে সাজগোজের ধুম পড়ে গেছে।

হঠাৎ খোজা-সর্দার পীরালির ডাকে চমকে উঠলো মুমতাজ।

বলেল—কে ? পীরালি ?

—জী হাঁ, বেগমসাহেবা!

—কী খবর?

—হেকিম-সাহাব আসছে। তসরিফ ওঠাতে হবে!

তাড়াতাড়ি মুমতাজ পোশাকটা বদলে নিলে। বাইরের লোক!

বাইরের লোকে বড় একটা চেহেল-সুতুনে আসে না। এলে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সাহেব-হেকিম আসবার কথা ছিল কাশিমবাজার থেকে। তাহলে এসেছে সে? তাড়াতাড়ি পায়জামা, পেশোয়াজ আর জুতো পরে নিলে মুমতাজ।

বললে—তুমি যাও পীরালি খাঁ, আমি এখনি আসছি—

পীরালি খাঁ খবরটা দিয়ে চলে গেল।

একটা মখমল-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো পীরালি খাঁ হেকিম-সাহেবকে।

ক্যাম্পবেল সাহেব চারদিকে চেয়ে দেখলে। সারা রাস্তাটাই দেখতে দেখতে এসেছে। মনে হয়েছে যেন দুনিয়ার বাইরে অন্য কোনও দুনিয়াতে এসেছে সে। এরই তো নাম শুনেছে সে এত। এর কথাই তো কলেট বলে দিয়েছিল।

কোথা থেকে যেন গানের শব্দ আসছিল। গানের সঙ্গে তারের মিউজিক বাজছে। আর দূর থেকে যেন নামাজ-পড়ার শব্দও কানে এল।

কী করবে বুঝতে পারলে না ক্যাম্পবেল।

—কই, গুলজারি বাঈ কোথায়? কার বেমার হয়েছে?

পীরালি খাঁ বললে—একটু সবুর ধরুন হেকিম-সাহাব, আসছে গুলজারি বাঈ—

ওপাশ থেকে যেন একটা আওয়াজ হলো। ঘণ্টা বাজার মতন। সেই শব্দটা পেতেই পীরালি খাঁ মখমলের পর্দাটা টেনে দিলে।

টানতেই ভেতরটা দেখা গেল। ভেতরে রূপোর খাঁচার মধ্যে একটা বেরাল বসেছিল। সত্যিকারের সিলভার, পিওর সিলভার।

আর তার ওপাশে নেটের পর্দা। পাতলা জালি। সেখানে একজন মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বড় সুন্দরী মেয়েটা। খুব বিউটিফুল মনে হলো ক্যাম্পবেলের চোখে।

ওকেই দেখতে হবে নাকি? ওরই অসুখ হয়েছে? ওই মেয়েটার? ওরই নাম গুলজারি বাঈ?

পীরালি খাঁ রূপোর খাঁচার দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরাল-টাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এল। নিয়ে এসে ক্যাম্পবেলের সামনে রাখলো।

ক্যাম্পবেল অবাক হয়ে গেছে।

বললে—এ বিল্লি নিয়ে কী করবো খোজা-সর্দার?

পীরালি বললে—এর-ই তো বেমার হেকিম-সাহেব। এই-ই তো গুলজারি বাঈ!

ক্যাম্পবেল সাহেব আকাশ থেকে যেন মাটিতে পড়ে গেল। এরই নাম গুলজারি বাঈ, এরই অসুখ করেছে? একে দেখতে এসেছে সে?

সাহেব ওপারে চেয়ে দেখলে। মেয়েটা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করে—বেমার কার? এই বিল্লির?

—জী হাঁ।

এবার উত্তর দিলে সেই মেয়েটা। বড় মিষ্টি গলার স্বর।

বললে—গুলজারি বাঈ নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি। ওকে আপনি কিছু দাওয়াই দিয়ে দিন।

ক্যাম্পবেল বড় মুশকিলে পড়লো।

বললে—দেখুন বেগমসাহেবা, আমি মানুষের রোগ দেখি, বেরালের হেকিমি তো করি না।

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদের অনেক হেকিম দেখে গেছে গুলজারিকে, কিন্তু কিছুতেই বেমার সারেনি। নানীবেগম বড় ভাবনায় পড়েছে, আপনি ওকে একটু ইলাইজ করে দিন মেহেরবানি করে—

সাহেব মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে এর ?

—বেমার হয়েছে।

—কী বেমার ? তকলিফ কী হচ্ছে ?

মুমতাজ বললে—কিছু খায় না আজ একমাস ধরে। কাবুল-মুলুকের বিল্লি। নবাব আলিবর্দী খাঁ নানীবেগমসাহেবার জন্যে ওকে কাবুল মুলুক থেকে আনিয়েছিলেন। বড় আয়েসী বিল্লি, খালি দুধ খায় আর মেওয়া খায়—

বেরালটার দিকে চেয়ে দেখলে সাহেব। বড় সুন্দর দেখতে। সোনালি-রূপালি গায়ের রং। ছোট ছোট পা। বাদামী গোল-গোল চোখ। আর গোঁফ। গায়ে পুরু লোম। লোমে সমস্ত মুখ প্রায় ঢেকে গেছে।

ক্যাম্পবেল বললে—ক'দিন ধরে এর এমন বেমার হয়েছে বেগমসাহেবা ?

মুমতাজ মিষ্টি গলায় বললে—আমি বেগমসাহেবা নই হেকিমসাহাব, আমি নানীবেগমসাহেবার খেদমদ্‌গারনী।

অবাক হয়ে গেল সাহেব। বুঝতে পারলে না কথাটা।

জিজ্ঞেস করলে—তার মানে ?

মুমতাজ এবার পীরালির দিকে ফিরলে।

বললে—পীরালি, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো।

পীরালি বললে—জী হাঁ—

বলে বাইরে চলে গেল।

মুমতাজ এবার পর্দাটা সরিয়ে সামনে এল।

সাহেব এবার মুখোমুখি চেয়ে দেখলে। সাহেব একটু সম্মান দেখাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

মুমতাজ বললে—তকলিফ করে দাঁড়ালেন কেন, বসুন। আমি বেগমসাহেবা নই—

—বেগমসাহেবা নন তো আপনি কী?

—আমি তো বললুম আপনাকে, আমি নানীবেগমসাহেবার খেদমদ্‌গারনী মুমতাজ—

সাহেব আরো হতবাক্ হয়ে গেল।

মুমতাজ বললে—এই গুলজারি বাঈ-এর খেদমদ্ করাই আমার কাজ। আমি দরবার থেকে তন্‌খা পাই এই কাজের জন্যে। আপনি আমার দিকে অমন করে চাইবেন না, গুলজারির দিকে চেয়ে দেখুন—

সাহেব এতক্ষণে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলে।

বললে—আমাকে মাফ করবেন—

মুমতাজ বললে—কিছু মনে করবেন না হেকিম সাহেব, টোপি-ওয়ালাদের ওপর চেহেল-সুতুনের নবাবের বড় গোসা। আপনি কিছু বেয়াদপি করলে আপনারই লোকসান হবে—তাই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—

ক্যাম্পবেল অনেকদিন ইণ্ডিয়ায় এসেছে, অনেক লেডীর চিকিৎসা করেছে, কিন্তু এমন ব্যবহার কখনও পায়নি, আর এমন করে বেরালের চিকিৎসার জন্যেও কেউ কল্ দেয়নি।

—পীরালি খাঁ!

হঠাৎ মুমতাজ খোজা-সর্দারকে ডেকে বসলো।

পীরালি খাঁ আসবার আগেই মুমতাজ আবার জালি-পর্দার ভেতরে চলে গেছে।

—হেকিম-সাহেবকে বলো গুলজারিকে যেমন করে হোক ভালো করতেই হবে।

ক্যাম্পবেল বুঝতে পারলে।

বললে—কিন্তু আমি তো ম্যাজিক জানি না, ভেল্কিবাজি জানি না, হুলাইজ করতে চেষ্টা করবো—

—না হেকিম-সাহেব, আমাদের গুলজারি বাঈ যদি না ভালো হয়ে যায় তো নানীবেগম বড় কষ্ট পাবেন। বড় পেয়ারের বিল্লি নানীবেগমসাহেবার—

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—বলুন ?

ক্যাম্পবেল বললে—এর জুড়ি আছে আপনাদের কাছে ?

—জুড়ি মানে ?

ক্যাম্পবেল বললে—জুড়ি মানে এর মরদ বেরাল আছে ?

মুমতাজ বললে—না। আলিজাহাঁ ওই গুলজারিকে একলাই নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে জোড়া আনেনি।

—কিন্তু এখন এর জুড়ি একটা যোগাড় করতে হবে মুমতাজ বাঈ। এখন তো একটু বয়েস হয়েছে। যখন একে আনা হয়েছিল তখন এর বয়েস ছিল কম, এখন বড় হয়েছে, জুড়ি না হলে এর তবিয়ত খারাপ হবেই—

মুমতাজ বললে—কিন্তু তার কোনও দাওয়াই নেই ?

ক্যাম্পবেল বললে—এ তো মেয়ে বেরাল, মরদ-বেরাল না হলে কী করে থাকবে ? আপনি আপনার নানীবেগমসাহেবাকে সেই কথা বলে দেবেন—

—কিন্তু মরদ-বেরাল এখন কোথায় পাবেন তিনি ?

ক্যাম্পবেল বললে—বাঙলার মসনদের নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদার যদি না যোগাড় করতে পারেন তো আমি কোত্থেকে যোগাড় করবো মুমতাজ বাঈ ?

—আপনাদের ফিরিঙ্গি-কুঠিতে নেই ?

ক্যাম্পবেল বললে—না—

—নানীবেগমসাহেবা দাম দেবে, যত দাম লাগে দেবে,

আপনি যোগাড় করে দিন না ?

—হেকিম সাহাব !

হঠাৎ পীরালি সর্দার কথার মাঝখানে বাধা দিলে।

বললে—হেকিম-সাহাব, শহরকা মরদ-বিল্লি হলে চলবে ?

—কোন্ শহর ?

পীরালি বললে—মুর্শিদাবাদ শহর ?

মুমতাজ পর্দার আড়াল থেকে আবার বললে—দেশি বিল্লি আমাদের চেহেল-স্তুনের ভেতরেও আছে হেকিম-সাহাব, কিন্তু তাদের সঙ্গে জোড় বাঁধতে দিই না, নানীবেগমসাহেবার বারণ আছে—

ক্যাম্পবেল বললে—তা না করাই ভালো, ওরাও তো মানুষের মত—

মুমতাজ বললে—আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন ?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি আর চেষ্টা করে কোথায় পাবো ! তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় চেষ্টা করবো—

—আর দাওয়াই ? দাওয়াই দেবেন ?

ক্যাম্পবেল বললে—আপনি যদি বলেন তো দাওয়াই আনতে পারি

—কবে আনবেন ?

—যেদিন তাঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেবেন।

—তাহলে জুম্মাবারেই তাঞ্জাম পাঠাতে বলবো নানীবেগম-সাহেবাকে—

তাই ঠিক রইলো। ক্যাম্পবেল সাহেব সেদিনকার মত চলে এল চেহেল-স্তুন ছেড়ে। আবার বাইরে এসে তাঞ্জামে উঠলো। তারপর, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাহেব পৌছে গেল কাশিমবাজারের কুঠিতে—

সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল ক্যাম্পবেলের জন্যে। কাশিমবাজার কুঠিতে সাহেবরা সেদিন আর কাজে বেরোয়নি। কুঠির ছোট

সাহেবের যাবার কথা কলকাতাতে। কলকাতায় জরুরী ডেসপ্যাচ নিয়ে যাবার শেষ দিন।

কলেট বললে—আর একটু দাঁড়াও স্মিথ, দেখি বেল্ ফিরে এসে কী বলে—

স্মিথ বললে—কিন্তু ডেসপ্যাচ নিয়ে যেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ফোর্ট উইলিয়মে ক্যাপটেন বড় ঝামেলা করে দেরি হলে—

—তা হোক, ডিপ্লোমেটিক ব্যাপারে শেষ খবরটাও পাঠানো উচিত।

—পরের উইকে পাঠলে চলবে না ?

কলেট বললে—ক্যাপটেন তখন বলবে ইম্‌পর্ট্যাণ্ট্ নিউজ কেন এত পরে পাঠালে ? ক্যাপটেন যে আবার কোম্পানীর হেড্-অফিসে সেইরকম ডেসপ্যাচ পাঠাবে!

এই ডেসপ্যাচই হচ্ছে কোম্পানীর আসল কারবার। চারদিক থেকে রিপোর্ট এনে তার থেকে আসল পয়েন্ট নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হয় ইংলণ্ডে কোম্পানীর হেড-অফিসে। রিপোর্ট যেতে ছ'মাস, তার উত্তর আসতেও ছ'মাস। ততদিনে দেশের হাল-চাল মতি-গতি সব কিছু বদলে গেছে। সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এসে হাজির হলো ক্যাম্পবেল।

ঘোড়া থেকে নেমেই এল কুঠির দফতরে।

—কী হলো ? কী খবর বেল্ ?

বেল্ বললে—আরে, ফর নাথিং আমাকে এত ট্রাবল্ দিলে ওরা। কিছু হয়নি কারো—

—কিছু হয়নি মানে, ফিস দিয়েছে ?

—হাঁ—

বলে পকেট থেকে একটা সোনার মোহর বার করে দেখালে।

বললে—মীর মুন্সী সাহেব খাজাঞ্চীখানায় নিয়ে গিয়ে এটা দিলে। বললে—আবার ডেকে পাঠাবে। আবার যেতে হবে চেহেল-সুতুনে—

—কার অসুখ ? কোন্ বেগমের ?

—গুলজারি বাঈ-এর—

—নবাবের বেগম নাকি ?

বেল্ বললে—আরে দূর, নবাবের বেগম হলে কি আর এক মোহর ফিস্ দেয় ?

—তাহলে চেহেল-স্তুনের কোনও বাঁদী ?

—না, নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদারের একটা ক্যাট্ আছে, বেরাল।

—বেরাল ? ক্যাট ?

ক্যাম্পবেল বললে—হ্যাঁ, সেই বেরালটারই আদরের নাম গুলজারি বাঈ—

কলেট হতাশ হয়ে পড়লো। কলেট ভেবেছিল যখন ক্যাম্পবেলকে বেগমের অসুখের জন্যে ডেকেছে, তখন বেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাকে চেহেল-স্তুনের ভেতরে যেতেই হবে। হয়তো সেই সূত্রে নবাবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর নবাবের সঙ্গে যদি দেখা না-ও হয় তো নবাবের আমীর-ওমরাও কারো সঙ্গে দেখা হবে। দুটো কথা হবে। এবং যদি কোনও খবর আনতে পারে ক্যাম্পবেল তো সেটা ক্যাপটেনকে জানিয়ে দেবে।

স্মিথ তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

কলেট বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে আছো কেন, তুমি স্টার্ট করো—যাও—বেরালের খবর পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই ক্যাপটেনের কাছে—

সত্যিই, চেহেল-স্তুনে বেরালের অসুখের খবর নিয়ে কারো শিরঃপীড়া থাকার কথাও নয়। কিন্তু শিরঃপীড়া যদি কারো থাকে, সে নানীবেগমসাহেবার। নানীবেগমসাহেবা এমনিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। আর কোনও কিছুতে তাঁর টান নেই। নাতি মীর্জার জন্যে

প্রথম-প্রথম ভাবনা হতো। রগ-চটা মানুষ, হঠাৎ ঝোঁকের বশে কিছু করে ফেললে তখন সারা চেহেল-সুতুন নিয়েই টানাটানি পড়বে। বাইরে যেমন মীর্জার দুষমন রয়েছে ভেতরেও তেমনি।

যখন সবাই যে-যার মহালে ফুর্তি করছে তখন নানীবেগমসাহেবার মনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলে।

একলা-একলাই কোরাণখানা খুলে পড়তে বসে।

কিন্তু তাতেও সব সময়ে মনটা বসে না। আস্তে আস্তে মহাল থেকে বেরোয়। তারপর টহল দিতে দিতে যায় নাত-বৌয়ের ঘরে। সেখানে লুৎফা চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। আলো জ্বলছে, আর বউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নানীবেগমসাহেবাকে দেখতে পায়নি সে। না দেখুক, নানীবেগমসাহেবা আবার সেখান থেকে মেয়ের মহালের ঘরের দিকে যায়।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা!

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ! নানীবেগমসাহেবা ফিরে দাঁড়ালো।

—কী খবর পীরালি? চারদিকের সব খয়রিয়াত্ তো?

—জী নানীবেগমসাহেবা, সব খয়রিয়াত্!

—গুলজারি বাঈ-এর তবিয়ত কেমন?

পীরালি বললে—কাশিমবাজার কোঠি থেকে ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব এসেছিল, ইলাইজ করে গেছে—

—দাওয়াই দিয়ে গেছে?

পীরালি বললে—না, আগ্‌লে হপ্তায় আবার হেকিমজী আসবে বলেছে দাওয়াই নিয়ে—

—মুমতাজ কোথায়?

—হুজুর বেমার-মহালে!

নানীবেগমসাহেবা যাচ্ছিল অন্য দিকে। কিন্তু মনে পড়তেই বেমার-মহালের দিকেই চলতে লাগলো।

—আচ্ছা, তুম্ যাও—

বেমার-মহালে বেমারীরাই থাকে। চেহেল-স্তুনে কারো অসুখ হলেই তাকে বেমার-মহালে পাঠানো হয়। বেমার-মহালে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে রোগীকে দেখবার জন্যে চেহেল-স্তুনের হেকিমকে পাঠানো হয়। তার জন্যে পাঞ্জা বেরোয় মীর মুন্সীর দফতরর থেকে হেকিম যদি ইলাইজ করতে না পারে তো তখন বৈদ্য আসে চক্-বাজার থেকে। চক্-বাজারে বৈদ্যজীদের আড্ডা। তারা বেমারির নাড়ি টেপে, রোগ ধরে। তারপর জড়ি-বুটি দেয়। তাতেও যদি না সারে, তখন আসে ফিরিঙ্গি হেকিম। কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরিঙ্গিদের আড্ডা! তাই শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারেই মীর মুন্সীকে পাঠানো হয়েছিল ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবের জন্যে!

নানীবেগমসাহেবা চেহেল-স্তুনের গলিপথ দিয়ে বেমার-মহালের দিকেই পা বাড়ালো।

এ এক অদ্ভুত দুনিয়া। এই চেহেল-স্তুন। কে কোথায় কখন যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, সব দেখাশোনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু এককালে নিজে এই সমস্ত দেখাশোনা করেছে নানীবেগমসাহেবা। কিন্তু নবাব আলিবর্দী খাঁ মারা যাওয়ার পর যেন কী রকম হয়ে গেল সব! এখন আর কিছু দেখে না নানীবেগমসাহেবা। যেমন চলছে চলুক। এখন যে-ক'দিন আল্লার নাম করে চালিয়ে নেওয়া যায়।

—মুমতাজ!

নানীবেগমসাহেবার ডাক শুনেই মুমতাজ ঘরের মধ্যে সোজা হয়ে বসলো। বড় ক্লান্ত লাগছিল সাহেব চলে যাওয়ার পর থেকেই। কোথায় কোন্ আমীর-ঘরের ঘরণী ছিল মুমতাজ, আজ হতে হয়েছে চেহেল-স্তুনে নানীবেগমসাহেবার খেদমদ্গাবনী।

আমীর সাহেব বড় পেয়ার করতো মুমতাজকে।

আমীর খুশ্‌রু ছিল আলিবর্দীর আমীর। কিন্তু আমীর খুশ্‌রু যখন ওড়িষ্যায় নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল তখন জখম হয়ে যায়। জোয়ান আমীর, আমীরের রিস্তাদাররা ঠকিয়ে নিয়েছিল বিধবার সম্পত্তি। সেই সময়ে নবাবের বেগম বিধবা মুমতাজকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে আসে।

আলিবর্দীর বেগমসাহেবা বলেছিল—তুমি এখানে থাকো বহেন, তোমার কোনও ভয় নেই—

চেহেল-সুতুনে সুন্দরী মেয়েদের ভয় নেই এ-কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মুর্শিদাবাদের আমীর-ওমরাও মহালে সুন্দরী মেয়েদের নাম নখের ডগায়। তারা খবর রাখে কার বাড়িতে কোথায় কোন্ কোণে একটা খুব্‌সুরত আওরাত্ আছে।

আমীর খুশ্‌রুর বিধবা বেগমকে নিয়ে তখন তোলপাড় চলেছে মুর্শিদাবাদে। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলার ইয়ার-বক্সীরা মতলব ভাঁজতে শুরু করে।

সফিউল্লা সাহেব অনেকদিন ধরে তাগ্ করে বসেছিল।

উড়িষ্যা থেকে যখন খবরটা এল যে আমীর খুশ্‌রু মারা গেছে তখনই আনন্দের চোটে সমস্ত দিন ধরে মদ খেতে লাগলো।

আনন্দের চোটে বলে উঠলো—শোভানাল্লা—

মীর্জা মহম্মদ তখনও নবাব হয়নি। ইয়ার-বক্সী নিয়ে তখন চারিদিকে হৈ-হল্লা করে বেড়ায়।

বড় ইয়ার নেশার মহম্মদ!

মেজো ইয়ার সফিউল্লা। সবচেয়ে ছোট ইয়ার ইয়ার জান!

সফিউল্লা বললে—মুমতাজ বাঈকে আমি সাদি করবো ইয়ার—

মীর্জা মহম্মদ বললে—তা কর—

সফিউল্লা বললে—করবো কী করে? নানীবেগম যে তাকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে গিয়ে তুলেছে—

মীর্জা বললে—একটু সবুর কর—দেখি আমি কী বন্দোবস্ত করতে পারি—

কিন্তু সফিউল্লা জানতো মীর্জা মহম্মদকে বিশ্বাস নেই। সুন্দরী আওরাত্ যদি একবার চেহেল-স্তুনে গিয়ে ওঠে তো মীর্জার নজরে সে পড়বেই।. আর একবার মীর্জার নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই।

মুমতাজকে ডেকে নানীবেগম বললে—তোর কেউ আপনজন আছে কোনও রিস্তাদার ?

মুমতাজ বললে—নেই—

—তা কেউ যদি তোর না থাকবে তো এত রূপ নিয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন ?

এ-কথার উত্তরে মুমতাজ আর কী বলবে ?

নানীবেগম অনেক করে তাকে লুকিয়ে রাখতো প্রথম-প্রথম। নিজের কাছে কাছে নিয়ে শুতো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। একলা ছাড়তো না চেহেল-স্তুনের মধ্যে।

খোজা-সর্দারকে ডেকে বলে দিয়েছিল—মুমতাজকে খুব চোখে-চোখে রাখবে পীরালি—

—জী বেগমসাহেবা !

নানীবেগম আরো বলে দিয়েছিল—বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তো তার কাছে কাছে থাকবে, যেন মুমতাজ বাঈ-এর কাছে ঘেঁষতে না পারে।

পীরালি খাঁ বললে—জী !

পীরালির সব কথাতেই ওই একই উত্তর—জী !

তখনও কোনও কাজ দেয়নি নানীবেগম। সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যেতো। কোরাণ পড়ে শোনাতে বলতো।

জিজ্ঞেস করতো—তোর এ-সব কাজ ভালো লাগে তো ?

মুমতাজ বলতো—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা—

—ভালো না লাগলে আমাকে বলবি।

তারপর বলতো—একলা-একলা থাকতে তোর খুব খারাপ লাগছে, না রে?

মুমতাজ বলতো—না বেগমসাহেবা—

—না রে, খারাপ তো লাগবেই। যার আদমী মারা যায় তার মনে কি সুখ থাকে রে? সুখ থাকে না।

এমনি কত করে বোঝাতো নানীবেগম।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তুই সাদি করবি মুমতাজ?

মুমতাজ চোখ নিচু করে ফেলেছিল। সে-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি বল্, তুই সাদি করবি?

মুমতাজ বলেছিল—না—

—লজ্জা করিসনে আমার সামনে। যদি তোর কাউকে পছন্দ হয়ে থাকে বল্, আমি তাকে চেহেল-সুতুনে আনিয়ে মোল্লা ডাকিয়ে সাদি দিয়ে দেবো—

মুমতাজ বলেছিল—না বেগমসাহেবা, আমি সাদি করবো না—

শেষে একদিন মীর্জাই কথাটা তুললো।

বললে—নানীজী, তোমাকে একটা কথা বলবো?

নানীজী বললে—কী, বল্ না?

—সফিউল্লা মুমতাজকে বিয়ে করতে চায়।

—কে সফিউল্লা?

মীর্জা বললে—আমার ইয়ার—

—তোর ইয়ার আমার মুমতাজকে দেখলে কী করে?

—দেখেছে নানীজী। যখন আমীর খুশ্রু সাহেব বেঁচে ছিল তখনই দেখেছে, দেখে দিল্ বিগড়ে গেছে। কিন্তু এখন তোমার মেহেরবানি।

সে-সব অনেকদিন আগের কথা। সে-সব দিনের কথা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল মুমতাজের।

নানীবেগম একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে—মুমতাজ, তুই সাদি করবি ?

মুমতাজ বললে—আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি নানীজী।

—ওরে, মেয়েরা কি মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলতে পারে ?

মুমতাজ বললে—কেন ও-কথা বলছো তুমি নানীজী। আমি সাদি করবো না—

—সাদি না করে জীবন-ভোর এই চেহেল-সুতুনে পড়ে থাকবি নাকি ?

—তা পড়ে থাকলে দোষ কী ?

নানীবেগম বললে—কিন্তু চিরকাল তো আমি থাকবো না রে—

মুমতাজ বললে—তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকবো নানীজী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

নানীজী মুমতাজের মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

বললে—ওরে, তা নয় বেটি, তা নয়, আমারও তো একদিন শেষ হবে! চিরকাল তো দুনিয়ায় কেউ বাঁচতে আসেনি। আমি মরে গেলে তোর কী হবে সেটা একবার ভেবেছিস ?

মুমতাজ তখন নানীজীর কোলের ভেতরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। চোখ তার জলে ভরে গেছে।

বললে—তুমি না থাকলে আমিও থাকবো না নানীজী—আমারও বেঁচে দরকার নেই—

নানীজী বলতো—দূর, দুনিয়াদারির তুই কিছুই বুঝিস না রে বেটি, দুনিয়াদারি আলাদা চিজ্। সেখানে কেউ তোকে খাতির-খেদ্‌মত্ করবে না। দুনিয়া তার পাওনা-গণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে উশুল করে নেবে। সে কেউ আটকাতে পারবে না—দিল্লির বাদশাই বলে দুনিয়াদারির হাত থেকে রেহাই পায়নি, আর তুই তো কোন্ ছার।

মুমতাজ নানীবেগমের কথাগুলো বসে বসে তখন কেবল শুনতো,

়ার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো—

মনে হতো এই নানীবেগমের আশ্রয়ের বাইরে গেলেই তাকে ়বাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। মনে হতো যেন সবাই তাকে গ্রাস করবে, ়বাই যেন গিলে ফেলবে।

মাঝে মাঝে চেহেল-সুতুনের মধ্যে ভীষণ ভয় লাগতো মুমতাজের। কী যেন এক অজানা ভয়। মনে হতো এখানে সবাই তার শত্রু। ়ারো কত বেগম রয়েছে চেহেল-সুতুনে। পেশমন বেগম, মরিয়ম ়বগম, গুলসন বেগম, বব্বু বেগম।

একদিন পেশমন বেগম ধরেছিল তাকে।

জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ভাই? নতুন এসেছ?

মুমতাজ বললে—না—

—তোমার নাম কী?

—মুমতাজ বাঈ।

—তোমার দেশ কোথায়?

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদ।

—মুর্শিদাবাদ?

পেশমন বেগম অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—মুর্শিদাবাদ থেকে কেন তুমি ভাই মরতে এলে এখানে? ়ক নিয়ে এল? নবাবের আড়কাটি?

মুমতাজ বললে—না, নানীবেগমসাহেবা আমাকে নিয়ে এসেছে—

—নানীবেগমসাহেবা? নানীবেগমসাহেবা কী করে তোমার তালাশ পেলে? কী মতলোব?

মুমতাজ বললে—আমার আদমী আমীর খুশ্‌রু—

—তুমি আমীর খুশ্‌রু সাহেবের বিবি? তা এখানে এলে কেন ভাই?

সবারই ওই এক প্রশ্ন। সবাই যেন মন-মরা হয়ে থাকতো

চেহেল-স্থতুনের ভেতরে। সরাব ছিল, আরক ছিল, বাঁদী খোজা সব ছিল, তবু যেন কারো মন ভরতো না।

তবু সন্ধ্যে হবার পরেই যেন অন্য চেহারা হয়ে যেতো চেহেল-স্থতুনের। বাইরে নহবতখানা থেকে নহবত বাজতে শুরু করতো আর ভেতরে তখন আতর-ওড়নী-জেবর-সরাবের বন্যা বয়ে যেতো। মহালে মহালে রোশনাই জ্বলে উঠতো। ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের গন্ধে ভরে উঠতো বেগম-মহাল। গানের স্থর ভেসে আসতো, নাচের ছন্দ।

যারা আরো অনেক বুড়ি হয়ে গেছে, তারা গড়গড়ায় শুয়ে শুয়ে তামাক খেতো। নবাব স্থজাউদ্দীনের আমলের বেগম সব। এককালে রূপসী ছিল, খুবস্থরত ছিল! এককালে রূপের জুলুস দেখিয়ে দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল নবাব আমীর-ওমরাওদের।

তখনও নেশা ছাড়তে পারেনি অনেকে। বুড়ি হয়ে গেছে, মুখের মাংস ঝুলে গেছে, বাতের দাওয়াই নিয়ে চলা-ফেরা করে, ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না তখন। কিন্তু নেশা ছাড়েনি। বাঁদীরা শিয়রে বসে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আর খোজারা রূপোর গড়গড়ার ওপর ঘন ঘন কলকে বদলে দিয়ে যায়।

একটু কানে শব্দ এলেই সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করে।

বলে—কে যায়? কৌন্?

মুমতাজ ভয়ে ভয়ে বলে—আমি—

—আমি কে? কেয়া নাম? কাঁহাসে তুম্ আতি হো?

তারপরে যখন সব শোনে তখন বলে—কেঁও আয়ি বেটি? ইধার কেঁও আয়ি?

সকলেরই এক কথা। জীবনে যে একদিন কত আরাম করেছে, কত ফুর্তি করেছে, কত মেহ্‌ফিল উড়িয়েছে, সে-সব কাহিনী যেন তখন দুঃস্বপ্নের মত তাদের জর্জরিত করে দেয়।

নানীবেগমসাহেবা একদিন বললে—না বেটি, তুই আর ওদিকে

যাসনে। তুই আমার গুলজারি বাঈকে দেখ, গুলজারির খেদমত্ কর। একটা তবু কাজ হবে তোর।

নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি।

গুলজারি বাঈ এককালে শৌখিন বেরাল ছিল চেহেল-সুতুনে। এককালে তার জন্যে দিল্লি থেকে দামী আতর আসতো। নবাব আলিবর্দী যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন খাবার আগে গুলজারি বাঈকে কাছে ডাকিয়ে আনতো।

যেন একটা পশমের গোলা। সোনালী-সবুজ-রূপালী পশমের ডেলা একটা। নবাব খানা খেতো। আর আশেপাশে বসে থাকতো গুলজারি।

নবাব কথা বলতো গুলজারির সঙ্গে।

একপাশে বসতো বেগমসাহেবা আর একপাশে গুলজারি বাঈ।

নবাব গুলজারিকে জিজ্ঞেস করতো—এত গোসা কেন রে গুলজারি? কার ওপর গোসা?

নানীবেগম বলতো—ও আলি জাঁহার ওপর গোসা করেছে—

নবাব হাসতো। বলতো—কেন, আমি আবার কী কসুর করলাম?

—বা রে! তুমি যে ওর সঙ্গে দিনভর কথা বলোনি!

—ও, তাই বটে!

কিন্তু গুলজারি একটা অবলা বেরাল। ও কী করে বুঝবে নবাবী চালানো কী খতরনাক কাজ! ও কী করে বুঝবে দুনিয়াদারি কী জিনিস! চারদিকে এত দুষমন নিয়ে নবাব যে খাওয়ার সময় পান সেইটেই তো খোদার মেহেরবানি! আর শত্রু কি শুধু বাইরের? শত্রু ঘরের ভেতরেও যে আড়ালে লুকিয়ে আছে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। সে নবাবও নেই, সে চেহেল-সুতুনও নেই। সেই নানীবেগমও নেই। এখন সব বদলে গেছে। বাইরের ঠাট্ ঠিক তেমনি আছে। তেমনি করেই সকালে বিকেলে

সন্ধ্যেয় সদর দরওয়াজার মাথায় নহবত বাজায় সরকারি নহবতিয়া। ভেতরে পীরালি খাঁ। খোজা-সর্দার তেমনি করেই খোজার দলকে নিয়ে পাহারা দেয়। কিন্তু মীর্জা মহম্মদ নবাব হওয়ার পরই তার ভেতরের চেহারা বদলে গিয়েছে।

মুমতাজ সেটা বুঝতে পারে।

নানীবেগমের মুখের চেহারাখানা দেখলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

অনেকদিন রাত্রে নানীবেগমসাহেবার মহালে গিয়ে দেখেছে, তার বাঁদী জুবেদা দরজার সামনে মেঝের ওপর পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর নানীবেগমসাহেবা তখন আলোর সামনে বসে মুখ নিচু করে কোরাণ পড়ছে।

আস্তে আস্তে মুমতাজ আবার নিজের মহালের দিকে ফিরে আসে। এসে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দেয়।

কিন্তু মুশকিল বাধলো গুলজারি বাঈ-এর বেমার হয়ে।

একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলো নানীবেগমের কাছে।

—কী রে বেটি? কী হয়েছে?

মুমতাজ বললে—গুলজারি বাঈ-এর বেমার হয়েছে নানীজী।

—কই, দেখি?

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। গুলজারি বাঈ-এর মহালের দিকে যেতে যেতে বললে—কী হয়েছে?

মুমতাজ পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

বললে—কিছু খাচ্ছে না নানীজী, দুধ খাচ্ছে না, গোস্ ভি খাচ্ছে না—

—মেওয়া? শুখা মেওয়া?

মুমতাজ বললে—তাও খাচ্ছে না, আমি সব রকম কোশিস করেছি—

—চল দেখি।

গুলজারি বাঈ-এর মহালে রূপোর খাঁচার ভেতরে তখন চুপ করে ঝিমোচ্ছিল গুলজারি।

নানীবেগম কাছে গিয়ে ডাকলে—গুলজারি—

গুলজারি চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তুলে একটু চাইলে।

নানীবেগম গুলজারিকে কোলে তুলে নিলে।

—কেয়া হুয়া তুমরা গুলজারি? কেয়া তকলিফ?

অনেকক্ষণ ধরে অনেক আদর খাতির করলে নানীবেগম। কিন্তু গুলজারির মন গললো না তবু। আবার গুলজারিকে রেখে দিলে খাঁচার ভেতর।

তারপর খোজা-সর্দার পীরালিকে ডাকলে।

পীরালি আসতে বললে—মীর মুন্সীকে খবর দে পীরালি, হেকিম-সাহেবকে এত্তেলা দেবে। এসে যেন গুলজারিকে ইলাইজ করে—

বলে নানীবেগম আবার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

এর পর হেকিম-সাহেব এসেছে, মুর্শিদাবাদ চক্-বাজার থেকে কাফের বৈদ্জী এসেছে, মোটা টাকা নিয়ে গেছে মীর মুন্সীর কাছ থেকে। দাওয়াইও দিয়েছে। কিন্তু গুলজারির অসুখ সারেনি। আরো গম্ভীর হয়ে গেছে গুলজারি বাঈ। আরো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

শেষকালে কাশিমবাজার কুঠি থেকে এল ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব।

নানীবেগমসাহেবা এসে ডাকলে—মুমতাজ—

—কী নানীজী!

—ফিরিঙ্গি হেকিম এসেছিল?

—হ্যাঁ, নানীজী!

—দাওয়াই দিয়েছে?

মুমতাজ বললে—দাওয়াই পাঠিয়ে দেবে বলে গেছে।

—কী বললে দেখে ফিরিঙ্গি হেকিম?

কী বলবে মুমতাজ, বুঝতে পারলে না।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—সারবে? বেমার ভাল হবে?

মুমতাজ বললে—হ্যাঁ নানীজী। সাহেব বলে গেল এর একটা জোড়া চাই—

—কীসের জোড়া?

—একটা মরদ বিল্লি আনতে হবে।

নানীবেগম বললে—মরদ বিল্লি তো চেহেল-সুতুনে অনেক আছে মুর্শিদাবাদ শহরেও আছে। মতিঝিলেও আছে—

মুমতাজ বললে—তাতে চলবে না নানীজী! হেকিম-সাহেব বলেছে খাস কাবুলের জাত্-বিল্লি আনতে হবে।

—সে কে আনবে?

মুমতাজ বললে—তা জানি না নানীজী!

নানীবেগমও বুঝতে পারলে না সে বেরাল কোথা থেকে আসবে কে আনবে। দিল্লির ভকীল-সাহেবকে খবর দিলে হয়তো কাবুল থেকে আনিয়ে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে নানীবেগম আবার তার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

কিন্তু ক্যাম্পবেল সাহেব আসার পর থেকেই আবার যেন সব ভালো লাগতে লাগলো মুমতাজের। আবার যেন চেহেল-সুতুনের সব কিছু অন্যরকম চেহারা নিলে। মনে হলো সাহেব আর একবার এলে যেন ভালো হয়।

ভাবলে, নানীবেগমসাহেবার কাছে গিয়ে বলবে। নানীবেগম-সাহেবার মহাল পর্যন্ত গেল।

নানীবেগম জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কিছু বলবি?

মুমতাজের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েও বেরোল না যেন।

—গুলজারি কেমন আছে রে আজ ?

মুমতাজ বললে—ভালো নেই নানীজী—

নানীবেগম বললে—তুই মন খারাপ করিসনি। আমি আর গুলজারির কথা অত ভাবতে পারিনে। আমার নিজের কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই। আমি কতজনের কথা ভাববো ? মীর্জার কথা ভাববো না ঘসেটির কথা ভাববো ?

সত্যিই তো, তিন মেয়ে, তিন মেয়েই যেন শত্রু হয়ে উঠেছে আজ। সবাই মীর্জার দুষমন হয়ে উঠেছে। মীর্জার নিজের মা-ও যেন ছেলের নবাব হওয়া সহ্য করতে পারছে না।

—নানীজী !

—কী রে, আবার কিছু বলবি ?

—আচ্ছা নানীজী, ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে আর একবার ডেকে পাঠাবো ?

—তা ডাক্ না ! পীরালিকে বল্, মীর মুন্সীকে খবর দেবে।

কথাটা বলেই যেন বড় লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়লো মুমতাজ! যেন আবার চোখাচোখি হয়ে গেল ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে। চোখের সামনেই যেন ভেসে উঠলো চোখ দু'টো। যেন সাহেব তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার সর্বাঙ্গ দেখছে।

—নানীজী !

নানীবেগম এবার অবাক হয়ে গেছে। কোরাণ ছেড়ে কাছে এল। চিবুকটা ধরে মুখটা উঁচু করে দেখলে।

বললে—কী হয়েছে বে তোর ? তোরও বেমার হলো নাকি ? চোখমুখ এত লাল কেন রে ?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকের ওপর নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে। যত কথা ছিল সব যেন কান্না হয়ে উজাড় করে দিলে নানীসাহেবার বুকের ওপর।

—তোরও বুখার ?

কপালে হাত দিয়ে দেখলে মুমতাজের গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে।

—তুইও আবার বোখার বাধিয়ে বসলি? তাহলে আমা গুলজারিকে কে দেখবে?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকে মুখ গুঁজেই বললে—আমার বুখার হয়নি নানীজী, বুখার হয়নি।

—হয়নি বলছিস কেন? এই তো আমি দেখছি হয়েছে।

তারপর মুমতাজকে ধরে বেমার-মহালের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—তুইও আমাকে শেষ পর্যন্ত জ্বালালি? আমাকে কি তোরা কেউ একটু শান্তি দিবি না? নিজের মেয়ে-জামাই, নাতি, তুই সবাই মিলে আমাকে জ্বালাবি?

চলতে চলতে বেমার-মহালে গিয়ে একটা ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে মুমতাজকে।

তারপর পীরালি খাঁকে ডাকলে।

বললে—পীরালি, চেহেল-সুতুনের হেকিম-সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয় তো—

—জী বেগমসাহেবা!

বলে পীরালি খাঁ চলেই যাচ্ছিল।

কিন্তু মুমতাজ বললে—না নানীজী, তোমার পায়ে পড়ি, হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না।

নানীবেগম রেগে গেল।

বললে—হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না তো তোর অসুখ সারবে কী করে?

—না নানীজী, তুমি সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে ডাকাও। কাশিমবাজার কুঠির—সে ভালো হেকিম, আমার রোগ ধরতে পারবে!

নানীবেগম অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী করে বুঝলি?

—আমি জানি নানীজী, ওরা ফিরিঙ্গিরা বেশি জানে।

—ঠিক আছে, তাহলে তাই ডাকাই—

বলে, পীরালি খাঁকে বললে—তুই মীর মুন্সীকে খবর দে, সেই কাশিমবাজার কুঠির ফিরিঙ্গি-হেকিমকে ডেকে আনবে—

পীরালি খাঁ হুকুম পেয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

সে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো দু'জনের মধ্যে। একজন সুদূর কোন্ দ্বীপ থেকে ভবঘুরের মত একদিন বেরিয়ে পড়েছিল নিরুদ্দেশ পাড়ির উদ্দেশে, সে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এই বাঙলাদেশে এসে আটকে পড়লো।

আবার ডাক পড়ে চেহেল-সুতুন থেকে, আবার সাহেব এসে হাজির হয় তাঞ্জামে। চেহেল-সুতুনের সবাই জেনে গেছে। সাহেবও জেনে গেছে, মুমতাজও জেনে গেছে।

সাহেব এলেই মুমতাজ বেমার-মহালের মধ্যে উঠে বসে।

সাহেব জিজ্ঞেস করে—কেমন আছো তুমি? হাউ আর ইউ?

অনেকদিন এসে এসে আগেকার সেই প্রথম দিকের আড়ষ্টতা কেটে গেছে দু'জনেরই।

মুমতাজ বলে—আমার কথা কাউকে তুমি বলোনি তো সাহেব?

ক্যাম্পবেল তখন বুঝে নিয়েছে যে চেহেল-সুতুনের কথা বাইরের কাউকে বলতে নেই।

তবু বললে—কাকে আবার বলবো?

মুমতাজ বলে—সেবার যে বললে, কাকে তুমি বলে দিয়েছিলে?

—সে তো ইয়াসিন, আমার বন্ধু—

মুমতাজ বললে—কী বলেছিলে?

—বলেছিলুম তুমি খুব বিউটিফুল!

—বিউটিফুল মানে?

সাহেব একটা-একটা করে ইংরিজী কথা শিখিয়ে দিয়েছিল।

বললে—বিউটিফুল মানে জানো না? বিউটিফুল মানে সুন্দর, খুবসুরত—

—জানো সাহেব, তুমি কিন্তু আমার চেয়ে আরো সুন্দর! আরো খুবসুরত!

ছ'জনেই হাসে।

ইয়াসিন প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করেছিল—কী রকম দেখতে রে ইয়ার?

—খুব বিউটিফুল!

—তোকে কেন ডেকেছিল? বেরালের রোগ তুই সারাতে পারবি বলেছিস?

সাহেব বলেছিল—বলেছিলুম পারবো—

—কী করে সারাবি! বেরালের রোগের ওষুধ জানিস তুই?

কাশিমবাজার কুঠির সাহেবরাও বলেছিল—তুমি যে বলে এলে রোগ সারিয়ে দেবে, তা সারাতে পারবে তো বেল্?

ক্যাম্পবেলের নিজেরও সন্দেহ ছিল সারাতে পারবে কি না। না পারে, না পারবে। রোগ যদি নাও সারে দেখতে তো পাবে মুমতাজকে।

প্রথম দিন মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে গিয়েই খানিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর একা একা কোথায় বেরিয়ে গেল টের পেলে না কেউ।

ইয়াসিন এসেছে দেখা করতে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—কী নিউজ ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললে—খবর তো সাহেবের কাছে। সাহেব কোথায়? সাহেব আসেনি?

কলেট বললে—এসেছে—

—তাহলে গেল কোথায়?

—এই তো এখানে ছিল এতক্ষণ। নবাবের সেরেস্তা থেকে একটা মাহর ফিস্ পেয়েছে। খুব আহ্লাদ।

—আর কী হলো সেখানে? কার অসুখ?

কলেট বললে—একটা বেরালের—

—বেরালের অসুখের জন্যে সাহেবকে ডাকা? তাহলে গুলজারি বাঈ কে?

কলেট বললে—লেট নবাবের বেগমের ক্যাট্। সেই ক্যাটের নাম গুলজারি বাঈ। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। তোমরাও তো কেউ জানতে না। আমি হোম-ডেসপ্যাচে তাই লিখে দিয়েছি—

—তা সাহেব গেল কোথায়? জিজ্ঞেস করলে ইয়াসিন।

কেউ জানে না কোথায় গেল। সেদিন সাহেবকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। সারাদিন গঙ্গার ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে কেবল!

ইয়াসিন পরের দিনও এল। সেদিনও জিজ্ঞেস করলে—বেল্ সাহেব কোথায়?

কলেট বললে—সে এখন খুব ব্যস্ত—

—কেন, বেল্ সাহেবকে তো কখনও ব্যস্ত দেখিনি! কিসের এত রাজকার্য তার?

কলেট বললে—সে বেরাল খুজে বেড়াচ্ছে একটা—

—বেরাল? বিল্লি?

কলেট বললে—হ্যাঁ, একটা মদ্দা বেরাল।

ইয়াসিন বললে—সে তো হাটে-মাঠে-বাজারে ছড়ানো আছে কাশিমবাজারে। ক'টা চাই?

কলেট বললে—হারেমের বেগমদের খেয়াল যখন হয়েছে তখন তা চাই-ই। আর যে-সে ক্যাট্ নয়, একেবারে কাবুল-ক্যাট্—

তা সত্যিই সে-ক'দিন ক্যাম্পবেল খুবই খুঁজেছে। মাঝখানে কলকাতাতেও গিয়েছিল। উমিচাঁদের বাড়িতেও গিয়েছিল একদিন।

উমিচাঁদ ক্যাম্পবেল সাহেবকে দেখে অবাক।

বললে—কী হলো সাহেব, আবার ফিরলে যে? কাশিমবাজার ভালো লাগলো না?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি একটা কাজে এসেছি মিস্টার উমিচাঁদ —আমাকে হেল্‌প্‌ করতে হবে, পারবে?

—কী হেল্‌প্‌, বলো?

ক্যাম্পবেল বললে—একটা মদ্দা কাবুলি বেরাল যোগাড় করে দিতে পারো?

—সে কী, বেরাল কী করবে?

—আমার জন্যে নয়, চেহেল-সুতুনের হারেমের বেগমের জন্যে।

উমিচাঁদ বললে—আমি আনিয়ে দিতে পারি। আমার এজেন্ট আছে সেখানে। কিন্তু সে তো আসতে দেরি হবে—

—কত দেরি?

—তা তিন মাসের আগে তো নয়।

ক্যাম্পবেল বললে—অত দেরি করলে চলবে না—আমার আরো তাড়াতাড়ি চাই—

উমিচাঁদের কেমন সন্দেহ হলো। বললে—তোমার এত কিসের তাড়া সাহেব?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি যে রোগী দেখছি—

—রোগী কে? কোন্ বেগম?

—বেগম নয়, গুলজারি বাঈ!

—নানীবেগমের বিল্লি? তাই বলো! সেইজন্যেই তোমার এত তাড়া! আমি তাড়াতাড়ি আনিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। কত টাকা দেবে?

ক্যাম্পবেল বললে—টাকা আমি দেবো না, নানীবেগমসাহেবাই দেবে। তা কত লাগবে বলো?

—একশো আশরফি!

ক্যাম্পবেল বললে—তা তাই-ই দিতে বলবো। নবাবের তো টাকার অভাব নেই—

—তাহলে কথা দিচ্ছ ঠিক ?

—টাকা কি আগে দিতে হবে ?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আগে দিলেই ভালো হয়। কারবারি লোক আমরা, টাকা আগে দিলে কাজের সুবিধে হয়।

ক্যাম্পবেল বললে—ঠিক আছে, আমি আগাম টাকাই চাইবো নানীবেগমসাহেবার কাছে—

বলে সেইদিনই কলকাতা থেকে আবার কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরে এল সাহেব। এবার খুশী-খুশী ভাব।

কলেট চেহারা দেখে অবাক।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, ক্যাট্ পেয়েছো ?

—পেয়েছি। উমিচাঁদ সাহেব যোগাড় করে এনে দেবে বলেছে।

কলেট বললে—উমিচাঁদের পাল্লায় পড়েছো তো, তাহলেই হয়েছে। লোকটা ডিস্অনেস্ট, কত টাকা চেয়েছে ?

—একশো গিনি! তা আমার কী? টাকা তো আমি পকেট থেকে দেবো না, টাকা দেবে যার বেরাল সে। নানীবেগমসাহেবার কি টাকার অভাব ?

সেদিন ওই পর্যন্তই।

কিন্তু হঠাৎ মীর মুন্সী আবার ডাকতে এল। আবার তলব হয়েছে চেহেল-সুতুনে।

—কী হলো মীর মুন্সী ? গুলজারি বাঈ কেমন আছে ?

মীর মুন্সী বললে—আবার তলব হয়েছে, আর একবার যেতে হবে ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে—

তা ভালোই হলো। আবার সেই তাঞ্জাম, আবার সেই পাঞ্জা।

বেমার-মহালে ঢুকেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল ক্যাম্পবেল।

—তোমার অসুখ ?

মুমতাজ সেদিন হাসলো একটু।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন ? অসুখ নয় ?

মুমতাজ বললে—অসুখ না হলে কি তোমাকে মিছিমিছি ডেকেছি সাহেব ?

—কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না শরীর খারাপ!

পর্দার আড়ালে বসেই কথা হচ্ছিল।

সাহেব বললে—হাতটা বাড়িয়ে দাও তো, দেখি—

মুমতাজ তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে জালি-পর্দার বাইরে। সাহেব নিজের হাত দিয়ে ধরলে মুমতাজের হাতটা। বড় নরম ঠেকলো সাহেবের কাছে। মাখমের মত নরম আর সাদা হাত মুমতাজের।

সাহেব অনেকক্ষণ ধরে হাতটা চেপে ধরে রইলো।

মুমতাজ বললে—অতক্ষণ ধরে কী দেখছো ?

সাহেব বললে—তোমার তো কিছু হয়নি!

—সত্যি আমার অসুখ হয়েছে, বিশ্বাস করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সাহেব বললে—ও-কথা বোলো না আমাকে, বলতে নেই—

—কেন, তোমার ভয় করছে ?

সাহেব বললে—আমি তো ইণ্ডিয়ান নই, আমাকে ও-কথা বোলো না। কেউ শুনতে পেলে তোমার ক্ষতি হবে!

মুমতাজ বললে—কেউ যাতে শুনতে না পায়, তার ব্যবস্থা আমি করেছি—

—কী ব্যবস্থা ?

মুমতাজ বললে—চেহেল-সুতুনে যে আমাদের খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ আছে, তাকে রিশ্‌শত্‌ দিয়েছি—

—কেন মিছিমিছি ঘুঁষ দিতে গেলে ? তোমার টাকা নষ্ট হলো!

মুমতাজ বললে—আমার কি টাকার অভাব সাহেব? আমার অনেক টাকা আছে। আমার স্বামীর অনেক টাকা ছিল, সে সব আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি, লাখ-লাখ টাকা। সে কেউ জানে না!

—তোমার যদি অত টাকা তো এই চেহেল-সুতুনে এলে কেন?

—ওই টাকার ভয়ে।

—শুধু টাকার ভয়?

মুমতাজ বললে—কিছু মনে করো না সাহেব, টাকার ভয় তো ছিলই, আমার রূপেরও ভয় ছিল। আমি ইচ্ছে করলে আমার এই রূপ দিয়ে এই চেহেল-সুতুনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতুম। আমার স্বামী থাকলে আমাব কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু এখন যে আমি বিধবা—

সাহেব বললে—কিন্তু এখন কি ইচ্ছে করলেই এই চেহেল-সুতুন থেকে বেরোতে পারো?

মুমতাজ বললে—না, এখন আর উপায় নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যই তো তোমায় ডেকেছি সাহেব। তুমি আমাকে বাঁচাও—

সাহেব ভয় পেয়ে গেল। চারিদিকে অসহায়ের মত চাইতে লাগলো।

মুমতাজ বললে—তোমার কোনও ভয় নেই সাহেব, এখানে কেউ আসবে না, আমি টাকা কবুল করে খোজাদের সরিয়ে দিয়েছি—সর্দার-খোজা বেমার-মহালের খিড়কীতে পাহারা দিচ্ছে—

সাহেব বললে—তুমি আমাকে আর লোভ দেখিও না মুমতাজ, আমি রাস্তার লোক, আমার টাকা-পয়সা-চাকরি কিছুই নেই। আমি কাশিমবাজার কুঠির সাহেবদের দয়ায় খেতে পাই।

—কিন্তু তুমি তো হেকিম, তুমি তো হেকিমি করো, ওদের দাওয়াই দাও—

সাহেব বললে—আমি হেকিম, কিন্তু টাকা তো নিই না কারো কাছ থেকে—আমি ইণ্ডিয়াতে এসেই হেকিমি শিখেছি, তাই টাকা নিতে লজ্জা করে—

—তোমার টাকার দরকার ?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার বন্ধু আছে কলেট, সে-ই আমাকে খাওয়ায়, পরায়—আমার টাকার দরকার নেই—

মুমতাজ বললে—এক কাজ করবে ?

—কী কাজ ?

মুমতাজ বললে—আমি আর এখানে থাকবো না। এখান থেকে চলে যাবো—

—কেন ?

—আমার আর ভালো লাগছে না এখানে থাকতে !

সাহেব অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু গুলজারি বাঈ ? তার জন্যে যে আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছি—

—কী ব্যবস্থা করেছো ?

—উমিচাঁদকে বলে কাবুল থেকে একটা জুড়ি আনতে বলে দিয়েছি !

মুমতাজ বললে—কে তোমাকে তা করতে বললে ?

—তুমিই তো বলেছিলে, মনে নেই ?

মুমতাজ বললে—কই, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমি সব ভুলে গেছি—

সাহেব বললে—তুমি ভুলে যেতে পারো, কিন্তু আমি কী করে ভুলবো ? আমি এখান থেকে যাওয়ার পর থেকেই তো গুলজারি বাঈ-এর ব্যাপার নিয়ে ভাবছি—

—আশ্চর্য !

মুমতাজ বললে—সত্যিই আশ্চর্য—

—কেন, আশ্চর্য কেন ?

মুমতাজ বললে—আশ্চর্য নয় ? আমি একটা জলজ্যান্ত মেয়ে-

ানুষ পড়ে রইলুম, আর তুমি কিনা একটা বিল্লিকে নিয়ে ভেবে স্থির ?

সাহেব বললে—তোমার কথাও তো ভেবেছি। যখনই গুলজারি বাঈ-এর কথা ভেবেছি তখনই তোমার কথা মনে াড়েছে—

—কেন, গুলজারি বাঈ-এর কথা ভাবলে আমার কথা তোমার মনে াড়তো কেন ?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার মুখ থেকেই কথাটা শুনতে াও ?

মুমতাজ বললে—এখানে তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, বলো না। মামি তো পীরালি খাঁকেও এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বমার-মহালে এখন কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি—

—কেন, গুলজারি বাঈ-এর তো অসুখ, সে-ও তো আছে!

—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও কি মানুষ ?

সাহেব বললে—মানুষকেই বুঝি তুমি ভয় করো ?

মুমতাজ বললে—মানুষই আমার শত্রু, তা জানো ? আমি বিধবা হবার পর মুর্শিদাবাদের মানুষই আমাকে সবচেয়ে বেশি জ্বালিয়েছে! বিশেষ করে যারা বড়লোক—

—কে ? তারা কারা ?

মুমতাজ বললে—নবাবের ইয়ার-বক্সীর দল, সফিউল্লা খাঁ, মহম্মদ নেশার, ওরা—সেদিন চেহেল-সুতুনে না এলে আমি তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতুম না। আমি জানতুম যে একবার এখানে এলে আর বেরোন যায় না, তবু অন্য কোনও উপায় না পেয়ে এখানে এসেছি—

—এখন তো আর তারা তোমার নাগাল পায় না ?

মুমতাজ বললে—এখনও সফিউল্লা সাহেব হাল ছাড়েনি—

—সে কী ?

—হ্যাঁ, সফিউল্লা সাহেব মনে করে আমি তো বেওয়ারিশ মাল না-ঘাটকা না-ঘরকা, আমার ওপর এখনও তাই তার এক্তিয়ার আছে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করবে?

—সেইজন্যেই তো বলছি সাহেব, আমায় তুমি বাঁচাও। আমার বেমার হোক আর না হোক, আমার কাছে মাঝে মাঝে তুমি এসো, আমি নানীবেগমসাহেবাকে বলে মীর মুন্সীকে দিয়ে তোমার কাছে পাঞ্জা পাঠাবো—

হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ হলো পর্দার ওপাশে।

—কে?

মুমতাজ ভয় পেয়ে গেছে। ওখানে কে?

—মুমতাজ?

গলা শুনেই মুমতাজ চমকে উঠেছে। বললে—তুমি যাও সাহেব, আমি তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো মীর মুন্সীকে দিয়ে—

সাহেব সেদিনও চলে এল চেহেল-সুতুনের বাইরে।

ঘটনাটা এমনি করেই গড়াচ্ছিল। কিন্তু আর এগোল না। হঠাৎ কলকাতায় কোম্পানীর দপ্তর থেকে খবর এল ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বেধে গেছে ইউরোপে।

কলেট সেদিন সোজা চলে গেল কলকাতায়। যাবার আগে ডাকলে ক্যাম্পবেলকে।

বললে—তুমি কলকাতায় যাবে বেল্?

—কেন, আমি কলকাতায় গিয়ে কী করবো?

কলেট বললে—দেখ বেল্, আগে আমাদের একটা এনিমি ছিল, একজনের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল, এবার দু'টো ফ্রন্ট্ হয়ে গেল আমাদের—ড্রেক বড় ভাবনায় পড়েছে, ওদিকে এ্যাড্মিরাল

ওয়াটসন্ বলে একজন আসছে, আর সঙ্গে আসছে ক্লাইভ—

—ক্লাইভ ? সে আবার কে ?

—ম্যাড্রাসের কুঠির লোক, ম্যাড্রাসের সেণ্ট ফোর্ট ডেভিড্ কন্‌কার করবার পর তার খুব নাম-ডাক হয়েছে।

সত্যিই কলেটের মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিল ক্যাম্পবেল, তার খুব ভয় হয়েছে। ফ্রেঞ্চরা মুর্শিদাবাদের নবাবের ফ্রেণ্ড, তারা যদি চেষ্টা করে তো ফিরিঙ্গিদের হটিয়ে দিতে পারে কলকাতা থেকে।

—তুমি যাবে না ?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি ভাই যেতে পারবো না—

—কেন, কাশিমবাজারে তোমার কী ?

ক্যাম্পবেল বললে—জায়গাটা আমার ভাল লেগে গেছে—

—কেন, কাশিমবাজার ভাল লাগবার কী আছে ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ক্যাম্পবেল বললে—এখানে অনেক ডাক্তারি-ওষুধ আছে, এখানে অত পলিটিক্স নেই কলকাতার মতন। কলকাতায় কেবল কে কার সর্বনাশ করবে তারই ষড়যন্ত্র চলছে দিন-রাত—।

তারপর হঠাৎ বললে—একটা কাজ করতে পারবে ভাই কলকাতায় গিয়ে ?

—কী ?

—মিস্টার উমিচাঁদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে ?

কলেট বললে—দেখা হবেই, সে-ই তো এইসব কন্‌স্‌পিরেসি চালাচ্ছে। সে নবাবেরও ফ্রেন্ড আবার আমাদেরও ফ্রেন্ড। সে নবাবের সব মুভমেণ্ট আমাদের জানাচ্ছে।

—তাহলে এক কাজ কোর, তাকে বলে দিও সেই কাবুলি-ক্যাট্ আর দরকার হবে না।

—কেন ? গুলজারি বাঈ ভালো হয়ে গেছে ?

ক্যাম্পবেল বললে—না, ভালো হয়ে যায়নি, কিন্তু তার আর দরকার নেই।

—দরকার নেই কেন? সেদিন যে চেহেল-সুতুনে গেলে? সে কাকে দেখতে?

ক্যাম্পবেল বললে—সে গুলজারি বাঈ নয়, মুমতাজ বেগমকে দেখতে—

—মুমতাজ বেগম? সে আবার কে?

ক্যাম্পবেল বললে—সে গুলজারি বাঈ-এর কেয়ার-টেকার!

—কী অসুখ তার?

ক্যাম্পবেল বললে—অসুখ নয়। অসুখের নাম করে সে আমাকেঁ প্রায়ই ডেকে পাঠায়।

—তার মানে?

ক্যাম্পবেল বললে—তুমি কাউকে বোলো না কলেট, সে আমাকে ভালবাসে—সি লাভস্ মি—

—হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

চমকে উঠেছে কলেট।

ক্যাম্পবেল বললে—ইয়েস্, আই মীন হোয়াট্ আই সে—

—আর তুমি? তুমিও তাকে ভালবাসো নাকি?

ক্যাম্পবেল বললে—ইয়েস্, আই ডু—

কলেট চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু কথাটা শুনেই আবার বসে পড়লো।

বললে—সত্যি?

ক্যাম্পবেল বললে—হ্যাঁ সত্যি—

কলেট বললে—তুমি খুব অন্যায় করেছো বেল্। ইট্ ইজ্ অ্যান অফেন্স, এ ক্রাইম। তুমি ইউরোপীয়ান, আর সে একজন ইণ্ডিয়ান। শুধু তাই নয়, সে নবাবের প্রপার্টি। তাকে নিয়ে ইলোপ্ করলে তোমারই শুধু ফাঁসি হবে তাই নয়, আমাদের কোম্পানীরও ক্ষতি

ব—কোম্পানীকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে—

ক্যাম্পবেল চুপ করে রইলো।

—আমি রিকোয়েস্ট করছি, তুমি আর চেহেল-সুতুনে যেও না। ান্ট্ গো দেয়ার।

ক্যাম্পবেল মাথা নিচু করে রইলো।

—আর, যদি তুমি যেতে চাও তাহলে আমার এখানে আর ামার থাকা চলবে না। কোম্পানী যদি জানতে পারে তো তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে, আমি হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে এখানে রাখতে পারবো না—

ক্যাম্পবেল তখনও মাথা নিচু করে রয়েছে।

কলেট বললে—কী হলো, যাবে? উত্তর দাও—

ক্যাম্পবেল কিছুই উত্তর দিলে না। তখনও ঠিক তেমনি করে চুপ করে রইলো।

কলেট সেই দিনই চলে গেল কলকাতায়।

কলেট নেই, কেউ নেই, সমস্ত কুঠি-বাড়িটা সেদিন বড় ফাঁকা মনে হলো ক্যাম্পবেলের কাছে। কাশিমবাজারের আকাশে সেদিনও অনেক তারা উঠলো, অনেক ভাবনা পাখা মেলে আকাশে উড়তে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বড় সুন্দর হয়ে উঠলো ক্যাম্পবেলের চোখের সামনে।

—সাহেব, সাহেব—

ইয়াসিনের গলা! ইয়াসিনের সঙ্গে আর তখন কথা বলতে ইচ্ছে হলো না সাহেবের। ডাকুক! সে সাড়া দেবে না আর। অনেক দিনের সঙ্গী ইয়াসিন। অনেক আড্ডার শরিক সে।

কুঠির দরোয়ান বললে—কে?

ইয়াসিন জিজ্ঞেস করলে—সাহেব আছে, বেল্ সাহেব?

দরোয়ান বললে—সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছে—

—এত সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে ?

—জী হাঁ।

—আর কলেট সাহেব ?

—কলেট সাহেব কলকাতায় চলে গেছে—

ইয়াসিন অগত্যা ফিরে গেল। সাহেবের কানে সব কথা পৌঁছলো কিন্তু তবু উঠলো না, তবু নড়লো না বিছানা থেকে। মনে হলো সবাই যেন মুমতাজের শত্রু। সবাই মিলে যেন মুমতাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেছে। সবাই মুমতাজের শত্রু, তারও শত্রু।

কিন্তু ইয়াসিন অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সাড়া না পেয়ে রাত্রে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

বাড়িতে গিয়েও ঘুম হলো না তার। আবার বেরোল।

মেমুদকে ডাকলে। বললে—দেখ্, আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি, কাল ফিরবো—

মেমুদ বললে—ঠিক আছে হুজুর—

রাত্রের মুর্শিদাবাদ। কোতোয়াল হুকুম দিয়ে দিয়েছে শহরে কড়া পাহারা দিতে হবে। দিনকাল ভাল নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলা করতে রওনা হতে পারে নবাব।

রাস্তায় যে যায় তাকে খাড়া করে দেয়।

জিজ্ঞেস করে—কে ?

তারপর নামধাম কুলুজী জেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। সন্দেহ হলেই রাতটার মত কোতোয়ালিতে আটক করে রাখে। বড় হুঁশিয়ার হয়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা মুলুক। সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এখানে নবাব কম-বয়েসী বলে তোমরা ওত পেতে আছ কখন মসনদ কেড়ে নেবে, কখন ন.... খুন করে মতিঝিল দখল করবে।

কিন্তু চারদিকে ফিরিঙ্গিদের চরও ঘুরছে, তারাও ওত পেতে আছে

জায়গায়। কেউ হেকিম সেজে, কেউ ফকির সেজে পথে-পথে
র বেড়াচ্ছে।

—সফিউল্লা সাহেব ?

সফিউল্লা সাহেব এমনিতেই বাড়ি থাকে না। বাড়ি থাকলে
লও না সফিউল্লা সাহেবের। নবাবের দিনকাল খারাপ চলেছে
খন। সব সময় ইয়ার-বক্সীদের পাশে থাকা চাই। মেহেদী নেশার,
ফিউল্লা, ইয়ার জান, ওরাই হলো তার দিন-রাত্রির সঙ্গী! মতিঝিলের
রবারে যতক্ষণ না নবাব ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তার পাশে
াকতে হয়।

তারপর যদি বাড়ির কথা মনে পড়ে তো তখন বাড়ি আসে।
হলে বাড়ি আসার দরকারও হয় না তাদের কারো।

সেদিনও অনেক রাত্রে বাড়ি এসেছিল সফিউল্লা সাহেব। হঠাৎ
নে হলো বাইরে কে যেন ডাকলে।

—কে ?

জানালা দিয়ে সাড়া দিলে সফিউল্লা সাহেব।

—আমি—আমি ইয়াসিন, ইয়াসিন খাঁ—

—কৌন্ ইয়াসিন ? কাঁহাকা ইয়াসিন ?

—কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ মুহম্মদ !

—কী খবর ? এত রাত্তিরে ?

—খোদাবন্দের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছে গরীব। একটা
রুরী কথা ছিল।

জরুরী কথা শুনেই ঘুম ছুটে গেল সফিউল্লা সাহেবের। জরুরী
বর একটা পেলে নবাবকে তা দিয়ে খুশী করা যায়। যত ষড়যন্ত্রের
বর চারদিক থেকে [illegible]ছে সব মীর্জার শোনা চাই।

তাড়াতাড়ি বৈ[illegible]খানার দরওয়াজা খুলে দিয়ে বাইরে এল
সফিউল্লা সাহেব।

বললে—এসো, দুনিয়ার হাল-চাল বাতাও—

—হাল-চাল বড়ি খারাপ জনাব। সব বরবাদ করে দিতে চা
ফিরিঙ্গি কোম্পানী।

—কী রকম? বোস বোস, আয়েস করে বোস। কুঠিওয়াল
সাহেব কোথায়?

ইয়াসিন ততক্ষণে আয়েস করে চৌকির ওপর বসেছে।

বললে—সেই খবর বলতেই তো এসেছি জনাব। ভাবলাম রাতে
রাতে আসাই ভালো। চারদিকে যেমন ফিরিঙ্গিদের চর ঘুরছে দি
রাত, কেউ আবার দেখে ফেলতে পারে—

—বলো, কী খবর? জবর খবর তো?

ইয়াসিন বললে—কুঠিওয়ালা কলেট সাহেব কলকাতায় গেছে—

—কেন?

—মনে হচ্ছে উমিচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে! ফিরিঙ্গিরা শায়ে
মুর্শিদাবাদে হামলা করতে পারে!

সফিউল্লা বললে—কী যে বেওকুফের মত কথা বলো তুমি ইয়াসিন
চন্দরনগরে ফ্রেঞ্চরা আছে কী করতে? ফ্রেঞ্চরা তো নবাবের দোস্ত্-

—তা জানি না জনাব, লেকিন কলেট সাহেব কাশিমবাজার
নেই!

সফিউল্লাও ভাবতে লাগলো কলকাতায় চলে যাওয়ার পেছন
কলেট সাহেবের কী মতলব থাকতে পারে!

ইয়াসিন বললে—আর একটা খবর হুজুর, ক্যাম্পবেল সাহেবে
মনে পড়ে?

—খুব মনে পড়ে—বললে সফিউল্লা। সেই শালা হেকিমটা?

—জী হাঁ জনাব!

তারপর একটু থেমে বললে—জনাবের সব ইয়াদ আছে দেখছি
আর আমীর খুশ্রুর বিধবা বেগমকে ইয়াদ আছে? সেই মুমতা
বেগম?

—খুব মনে আছে ইয়ার। মনে আবার নেই?

—সেই তারই খবর বলছি। ক্যাম্পবেল সাহেব তো হেকিমি করতে গিয়েছিল চেহেল-সুতুনে। জানেন তো? সে খবর তো আপনাকে বলেছি—

—হ্যাঁ, সে তো নানীবেগমসাহেবার বিল্লি গুলজারি বাঈ-এর বেমারের জন্যে!

· ইয়াসিন বললে—নেহি হুজুর, বেমারের বাত পুরো ধাপ্পা!

—ধাপ্পা?

—জী হাঁ জনাব! আস্‌লি বাত হচ্ছে মুমতাজ বাঈ। মুমতাজ বাঈকে সাহেব পেয়ার করতে আরম্ভ করেছে। সাহেবের দিল বিগড়ে গেছে মুমতাজ বাঈ-এর জন্যে!

—কৌন্ কহা তুমকো?

—কলেট সাহেব!

—সাঁচ বাত?

—জী হাঁ জনাব, একদম আস্‌লি সাঁচ্ বাত।

সফিউল্লা সাহেব কথাটা শুনে কী যেন ভাবলে আপন মনে। তারপর বাড়ির ভেতরে গেল। সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন তার হাতে একমুঠো মোহর।

ইয়াসিনের দিকে মোহরগুলো এগিয়ে দিয়ে বললে—এগুলো নাও, পিছে ঔর ভি মিলে গা। আরো জবর খবর দিয়ে যেও, আমার আরো খবর চাই—

ইয়াসিন মোহরগুলো নিজের কুর্তার পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বললে—তকলিফ মাপ করবেন জনাব, জরুরী খবর বলেই এত রাতে জনাবের ঘুম ভাঙিয়ে তকলিফ দিলুম—

তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় পড়ে টাকাগুলো পকেট থেকে বার করলে। গুনতে লাগলো এক-এক করে। কত দিলে জনাব!—এক-দো-তিন-চার···

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার যথারীতি ডাক পেয়ে ক্যাম্পবেল এসেছে চেহেল-স্তুনে।

মুমতাজের তখনও বেমার সারেনি। বেমার হলেই সুবিধে বেশি। বেমার হলেই ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেবকে ঘন ঘন ডাকা যায়। বেমার-মহালে থাকলেই একটু নিরিবিলি কথা বলা যায় হেকিম সাহেবের সঙ্গে—

সেদিন সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। অনেক মোহর, অনেক জেবর, অনেক সোনা-চাঁদি একটা পুঁটলিতে বেঁধে কাছে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সাহেব এলেই তার হাতে সব তুলে দেবে।

ক্যাম্পবেল কিন্তু এর জন্যে তৈরি ছিল না।

বললে—এ সব কী হবে?

মুমতাজ বললে—তোমার টাকাকড়ি নেই বলছিলে, তাই তোমাকে দিলাম। আমাদের সংসার চালাতে তো অনেক টাকা খরচ হবে—

—আমাদের সংসার মানে?

মুমতাজ হাসলো।

বললে—বা রে, তুমি সত্যিই একটি আস্ত বোকা। যখন তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে তখন সংসার করতে টাকা খরচ হবে না?

—তুমি আমাকে সাদি করবে?

—এত কথার পর তুমি এই কথা বলছো সাহেব? সাদি না করে কি তোমার রাখেল্ হয়ে থাকবো? আমি যে তোমার বিবি হতে চাই!

ক্যাম্পবেল সাহেব এবার ভয় পেয়ে গেল।

বললে—সাদি করবারই তো টাকা নেই আমার—

—সেই জন্যেই তো আমার জমানো টাকা তোমাকে দিচ্ছি!

—কিন্তু এ যে অনেক টাকা!

মুমতাজ বললে—অনেক টাকা না হলে তুমি দেশে ফিরে যাবে

ী করে? জাহাজ-ভাড়ার টাকা লাগবে না? বাকি টাকা দিয়ে কটা জাহাজ কিনবে—

—জাহাজ? জাহাজ কিনে কী করবো?

তারপরের কথা ভাবতেও যেন ভয় করছিল ক্যাম্পবেলের। মুমতাজের সামনে বসেই থরথর করে কাঁপতে লাগলো সে। এ ব্যাপার যে ঘটবে তা তো কল্পনাও করেনি সে।

মুমতাজ বললে—আমি এদিকে হজে যাবার নাম করে মক্কায় যাবো—

—তারপরে?

মুমতাজ বললে—আমি সব মতলব ভেঁজে ঠিক করে রেখেছি সাহেব। তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে ডাকাতি করবে সেই জাহাজে। পারবে না? হজযাত্রীর জাহাজ আটক করতে পারবে না?

—তুমি বলছো কী?

মুমতাজ এবার উঠে বসলো। আর যেন তার লজ্জা-সরমের বালাই রইলো না।

বললে—তুমি যদি আপত্তি করো আমি এই চেহেল-সুতুনের মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হবো—তা বলে রাখছি—

ভয় পেয়ে ক্যাম্পবেল একটু পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করলে।

—বলো, টাকা নেবে তুমি?

একেবারে দু'হাতে সাহেবের হাতটা টিপে ধরেছে মুমতাজ।

—বলো, কথা বলো, উত্তর দাও।

ক্যাম্পবেল বললে—আমাকে দু'দিন ভাবতে দাও মুমতাজ বাঈ, দুটো দিন একটু সবুর করো। আমি আমার বন্ধু কলেটকে জিজ্ঞেস করি, আমার আর এক বন্ধু আছে ইয়াসিন, তাকেও জিজ্ঞেস করতে হবে, তাদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে।

—খবরদার!

বলে, মুমতাজ সাহেবের মুখটা চেপে ধরলে।

—তোমার কি কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ? এ সব কথা কি কাউকে বলতে
আছে ? এ-সব ব্যাপারে কি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়
চেহেল-সুতুনের খবর কি বাইরের কাউকে দিতে আছে ? তাতে যে
তুমিও খুন হয়ে যাবে, আমাকেও ওরা খুন করে ফেলবে !

—কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে সময় দেবে তো !

—ভাববার যে আর সময় নেই।

ক্যাম্পবেল বললে—দুটো দিন, দু'দিনের মধ্যেই আমি তোমায়
জানিয়ে দেবো—

মুমতাজ বললে—কিন্তু তুমি জানো না, আমি কী বিপদে
পড়েছি—

—কী বিপদ ?

মুমতাজ বললে—সফিউল্লা খাঁ খবর পেয়ে গেছে—

—কীসের খবর ? কে সফিউল্লা খাঁ ?

মুমতাজ বললে—নবাবের দোস্ত্, খবর পেয়েছে যে আমি হজ
করতে যাবার চেষ্টা করছি, নানীবেগমসাহেবাকে বলেছি, নানীবেগম-
সাহেবাও রাজী হয়েছে—

ক্যাম্পবেল বড় মুশকিলে পড়লো। বললে—কিন্তু আমি যে
জাহাজ কিনবো, জাহাজের যে আমি কিছুই জানি না—

—তুমি ফিরিঙ্গি, তার ওপর পুরুষ মানুষ, তুমি একটা সামান্য
জাহাজও কিনতে পারবে না ?

ক্যাম্পবেল বললে— আমি যে কখনও জাহাজ কিনিনি আগে—
জাহাজে চড়ে হিন্দুস্থানে এসেছি শুধু—আর ডাকাতি কী করে করবে
তাও বুঝতে পারছি না—

—তা হোক, তুমি এগুলো নাও, এ তোমাকে নিতেই হবে—

ক্যাম্পবেল বললে—আর দুটো দিনও সময় দেবে না ?

মুমতাজ বললে—দুটো দিন সময় দিলে, টাকাগুলো সব সফিউল্লা
খাঁ সাহেব খেয়ে ফেলবে—আমি তার ভয়েই বেমার-মহালে পড়ে

আছি অসুখের ভান করে—

ক্যাম্পবেল বললে—তাহলে ঠিক আছে, তুমি দিচ্ছ তাই নিচ্ছি—

বলে পুঁটলিটা নিলে নিজের কাছে।

মুমতাজ বললে—আমি খোজা-সর্দার পীরালী খাঁকে দিয়ে খবর দেবো কবে আমি হজে যাচ্ছি, কোন্ তারিখে জাহাজ মুর্শিদাবাদ থেকে ছাড়ছে—

—তুমি একলা হজে যাবে?

মুমতাজ বললে—না, নানীবেগমসাহেবাকেও রাজী করিয়েছি, নানীজীও সঙ্গে যাবে—

—ঠিক আছে, আজ তাহলে আমি উঠি—

—তোমাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না সাহেব, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে আর পারছি না। তাহলে তোমাকে আমি খবর দেবো, বুঝলে? তুমি ওই টাকা নিয়ে একটা জাহাজ কিনে ফেলবার চেষ্টা করো। ও আমার নিজের টাকা, তুমি ওটা তোমার নিজের টাকা বলেই মনে করো—

বলে সাহেবের সঙ্গে বেমার-মহালের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

সাহেব পেছন ফিরে বললে—সেলাম আলাইকুম—

মুমতাজ হাসলো। বড় করুণ সে হাসি। কিন্তু সেলাম করতে ভুলে গেল সে।

তাঞ্জামটা দাঁড়িয়েছিল। সাহেবকে নিয়ে আবার চলতে লাগলো চেহেল-সুতুন পেরিয়ে বাইরের দিকে—

বাংলা-মুলুকের সে এক বড় দুর্দিন। মুর্শিদাবাদের মানুষ অস্থির হয়ে দিন কাটায়। এক-একদিন এক-এক রকম গুজব রটে। এক-একদিন রটে ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদে হামলা করতে আসছে। আবার

এক-একদিন রটে যায় নবাব কলকাতায় যাচ্ছে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে—

ভয়ে-ভয়ে কাটে দিন, ভয়ে-ভয়ে কাটে রাত। নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর থেকেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে।

হঠাৎ কোনও দিন মাঝ-রাতে হৈ-হৈ আওয়াজ ওঠে ফৌজী-সেপাইদের ছাউনিতে। লোকেরা ভয়ে আঁতকে ওঠে—ওই বুঝি ফিরিঙ্গিরা এল।

বাপেরা মেয়েদের ডাকে—ওরে, ওঠ্ ওঠ্—

ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই ঘুম ভেঙে উঠে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আবার হয়তো সেই বর্গীদের আসার মত ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাতে হবে!

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ার জানও—দের অত ভয় করে চলা-ফেরা করতে হয় না। মাঝরাতেও ওরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে।

সেদিন নানীবেগমসাহেবার দরবারে খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ গিয়ে দাঁড়ালো।

—কৌন্?

—পীরালি খাঁ, নানীবেগমসাহেবা—

—সফিউল্লা সাহেব এসেছে?

—জী হাঁ—

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে দরবার-মহালের দিকে চলতে লাগলো। সফিউল্লা সাহেব ক'দিন থেকেই এত্তেলা পাঠাচ্ছিল।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা!

—কী খবর সফিউল্লা?

—আমি নানীবেগমসাহেবার কাছে অনেকবার দরবার করেছি, এবার একটা খবর দিতে এসেছি।

—কীসের খবর বলো?

—মুমতাজ বেগমের খবর।

নানীজী বললে—তা, সে তো মীর্জার কাছেই বলতে পারতে বাবা তুমি। আমার কাছে কেন? আমি তো আর কিছু দেখি না এখন!

—মীর্জা মামুদ এখন খুব ব্যস্ত নানীজী, তাই আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।

—কী দরবার বলো?

—আপনি কি মক্কায় হজ করতে যাবেন নানীবেগমসাহেবা?

—কে বললে?

সফিউল্লা বললে—আমি সব শুনেছি, আপনার সঙ্গেই মুমতাজ বাঈও যাচ্ছে তো?

নানীজী বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

সফিউল্লা বললে—আমার কাশিমবাজার কুঠির চর ইয়াসিন খাঁ সব আমাকে বলেছে—

—কিন্তু হজ করতে যাওয়া কি অন্যায়?

—অন্যায় নয় নানীজী! কিন্তু শুনলুম মুমতাজ বাঈ অন্য মতলোব করেছে।

—কী মতলোব?

—কাশিমবাজার কুঠির ফিরিঙ্গি-হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে াব টাকা দিয়ে দিয়েছে জাহাজ কেনবার জন্যে।

—জাহাজ? জাহাজ কিনবে কেন? জাহাজ কিনে কী হবে?

—ডাকাতি করে মুমতাজ বাঈকে নিয়ে পালাবে! সাদি করবে—

নানীবেগমসাহেবা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বললে—সব সত্যি কথা?

—হ্যাঁ, সব ঠিক!

—সব ইয়সিন খাঁ বলেছে?

—জী হাঁ, আমাদের সরকারী চর, কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ—

নানীবেগমসাহেবা বললে—তাকে ডেকে আনতে পারো ?

—জী হাঁ, সে তো দাঁড়িয়ে আছে—

—ডাকো তাকে !

সফিউল্লা খাঁ তাকে ডাকতে গেল চেহেল-স্তুনের বাইরে—

কিন্তু কোথা থেকে যে কী কাণ্ড হয়ে গেল তা মুমতাজও জানতে পারলে না, কাশিমবাজারের কুঠির ক্যাম্পবেল সাহেবও জানতে পারলে না।

একটা জাহাজ! একটা শুধু জাহাজ কেনবার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সাহেব।

কলেট বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি ? এত জিনিস থাকতে জাহাজ ?

ইয়াসিনকেও বলেছিল জাহাজের কথা।

ইয়াসিনও প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—জাহাজ ? জাহাজ কিনে তুমি কী করবে সাহেব ? এত জিনিস থাকতে জাহাজ ? ডাকাতি করতে বেরোবে নাকি ? ডাক্তারি ছেড়ে ডাকাতির পেশা ধরবে ?

ক্যাম্পবেল বলেছিল—না, জাহাজ আমার চাই—

শেষে জাহাজের খোঁজে কলকাতায় চলে গেল একদিন। কলকাতায় পৌঁছে একেবারে উমিচাঁদ সাহেবের বাড়ি।

উমিচাঁদ দেখে অবাক।

—তুমি ? এ্যাদ্দিন কী করছিলে ? কোথায় ছিলে ?

ক্যাম্পবেল বললে—আমায় একটা জাহাজ কিনে দিতে পারো উমিচাঁদ সাহেব ?

—জাহাজ ?

জাহাজের কথা শুনে উমিচাঁদও অবাক হয়ে গেল।

বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি? ডাক্তারি ছেড়ে তুমি
তি করবে নাকি?

—না উমিচাঁদ সাহেব, জাহাজ আমার একটা জরুরী দরকার।
টাকা লাগে আমি দেবো, আমার কাছে অনেক টাকা আছে,
অভাব আমার নেই। এই দেখ—

বলে পোঁটলাটা উমিচাঁদের চোখের সামনে খুলে ফেললে।

—এ কী, এত মোহর, এত গয়না? এসব কার? কোত্থেকে পেলে?

ক্যাম্পবেল বললে—সে-সব কাউকে বলবো না, এ এখন আমার
পার্টি, এ টাকা দিয়ে আমাকে একটা জাহাজ কিনে দাও উমিচাঁদ
ব—

উমিচাঁদ বললে—কিন্তু জাহাজের তো অনেক দাম—

—কত দাম?

উমিচাঁদ বুঝতে পারলে সাহেব কোথাও মজেছে।

বললে—তোমার সেই কাবুলি-ক্যাট্ আর কিনবে না?

সাহেব বললে—না, এখন জাহাজ কিনবো, ক্যাটের আর দরকার
নই—

উমিচাঁদ বললে—ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে টাকাগুলো
রখে যাও, যা দাম লাগে রেখে, বাকিটা তোমাকে ফেরত দেবো—

সাহেব পোঁটলাটা রেখে উঠলো। তখনি আবার ফিরে যেতে হবে
শিমবাজারে।

বললে—গুড্ বাই—গুড্ বাই—

উমিচাঁদ তখন গয়নার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়েছে। বললে—আর
কটু বসবে না? ভাল ড্রিঙ্ক ছিল আজ—

সাহেব তখন উঠে পড়েছে।

বললে—না সাহেব, আমার আর সময় নেই, হয়তো চেহেল-সুতুন
আবার ডাক আসবে—

—গুলজারি বাঈ-এর বেমার সেরেছে?

ক্যাম্পবেল যেতে যেতে পেছন ফিরে বললে—না—

উমিচাঁদ তখন সকলের আড়ালে নিজের ঘরে ঢুকেছে। অন্ধকা ঘরে আলোটা নিজের হাতেই জ্বাললে। তারপর সিন্ধুকটা খুললে

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে!

—কে ?

—আমি জগমোহন হুজুর!

তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা আবার বন্ধ করে দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখে জগমোহন দাঁড়িয়ে আছে।

—হুজুর, সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেব আবার এসেছে—

—ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেব ?

বাইরে আসতেই দেখে, ক্যাম্পবেল সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

—কী খবর ?

ক্যাম্পবেল হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—সাহেব, নবাব আসছে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করতে—

—সে কী ?

সাহেব বললে—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম কলকাতা থেকে সব লোক পালাচ্ছে, নবাবের ফৌজ আসছে কলকাতার কেল্লার দিকে, হালসীবাগানের দিকে আসছে—

উমিচাঁদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বললে—আচ্ছা তুমি ভেতরে এসো, দেখি কী করতে পারি!

ক্যাম্পবেল সাহেব বাড়ির ভেতর ঢুকলো। আর ওদিক থেকে নবাবের ফৌজ ততক্ষণে আরো এগিয়ে এসেছে কলকাতার দিকে

চেহেল-সুতুনের ভেতরে তখন আর এক উৎসব চলেছে। সফিউল্লা সাহেব বর সেজে এসেছে। চেহেল-সুতুনের ভেতরেই সাদির বন্দোবস্ত করেছে নানীবেগমসাহেবা।

মৌলভী হাজির।

মুমতাজ বাঈ নিজের মহালে তখন সাজছে। সাজতেই তার সময় লাগছে অনেকক্ষণ।

আজ বেগমদেরও উৎসব। নহবতখানায় লগনের রাগ বাজাচ্ছে নহবতিয়া। পেশমন বেগম, বব্বু বেগম, লুৎফা বেগম সবাই সেজেছে মুমতাজ বেগমের সাদির জন্যে! আবার অনেক দিন পরে একটা উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে চেহেল-সুতুনে।

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁর কাজের আর শেষ নেই।

মৌলভী সাহেব আবার তাগাদা দিলে—কই, কাঁহা, নয়ি বিবি কাঁহা?

নানীবেগমসাহেবা জুবেদাকে তাগাদা দিলে।

বললে—ওরে, মুমতাজকে ডেকে নিয়ে আয়, এত দেরি করছে কেন সাজতে?

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ার জান তারাও এসেছে। সফিউল্লা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মুমতাজের জন্যে!

হঠাৎ জুবেদা এসে খবর দিলে—নানীজী, সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী সর্বনাশ রে?

—মুমতাজ বাঈ জহর খেয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙলা-মুলুকের একটা মেয়ের জীবন শেষ হয়ে গেল নিঃশব্দে। একদিন কোন্ দূর থেকে একটা ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসে পড়েছিল। কোথায়ই বা রইলো সে, আর কোথায়ই বা রইলো সেই মুমতাজ বাঈ। সামান্য গুলজারি বাঈকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী শুরু হয়েছিল তা সেই মর্মান্তিক পরিণতিতেই বুঝি সমাধি লাভ করলো।

যখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার আক্রমণে ফিরিঙ্গি-ফৌজ কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, যখন উমিচাঁদের বাড়িটাও আগুন লেগে দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তখন কেউ জানতে পারলো না, আর একজনের দাবদাহর

যন্ত্রণা। সে মুমতাজ বাঈ। মুমতাজ বাঈ ততক্ষণে সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে শান্তির সন্ধান পেয়েছে। ইতিহাসে তাই মুমতাজ বাঈ-এর নাম কেউ লিখে যায়নি। ক্যাম্পবেল সাহেবের নামেরও উল্লেখ করেনি এমন কি যাকে উপলক্ষ্য করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে সেই গুলজারি বাঈ-এরও উল্লেখ নেই কোথাও। চেহেল-স্তুনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্মৃতিও সকলের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

আর ক্যাম্পবেল? উমিচাঁদ সাহেবের বাড়ি যখন আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছে, তার মধ্যে ক্যাম্পবেল সাহেবও পুড়ে মরেছে কিনা তার কোনও হদিস কোথাও নেই।
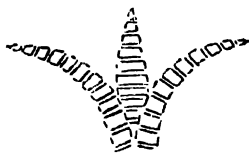
প্রেমের এ-কাহিনী যেমন সেকালের কাহিনী, একালেরও তেমনি। সেকালের বিদেশী সাহেব একালে দেবদাস হয়ে জন্মায়। তফাত শুধু এইটুকুই। বাইরের পোশাকটা বদলালেই সর্বকালের মানুষটা বেরিয়ে পড়ে। সেই নবাব-বাদশা-বাঁদী-খোজারা একালে অদৃশ্য হয়েছে বটে, কিন্তু অন্য নামে, অন্য পোশাকে, অন্য পরিচয়ে তারা আছে, অন্য পরিচয়ে তারা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু তবু দু'শো বছর তো পার হয়ে গেছে। বাইরের খোলসটা এত বেশি বদলে গেছে যে তাদের পুরোপুরি দেখা যায় না। চিনলেও আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বলা যায় না—ওই লোকটাই সে—

এই যেমন সুশান্ত।

কলেট সাহেবের মত এই সুশান্তও একদিন আটকে পড়েছিল নিজের তৈরি এক জালে। মানুষ যে ধরা পড়ে সে তো মানুষের নিজের স্বভাবেই। নিজের স্বভাবই তাকে মায়ায় জড়িয়ে ধরে, আবার মায়ার

বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সেই মানুষ কেবল ছটফট করে। যখন মুক্তি পায় তখনই আবার চায় মায়ায় জড়াতে।

এ এক অদ্ভুত লীলা!

এই একটা জীবনে, কত মানুষকেই দেখলাম। একাধারে কত উত্থান কত পতনের নীরব সাক্ষীই যে রইলাম, তার হিসেব-নিকেশ যে করে করতে পারবো কে জানে। যৌবনের উচ্ছ্বাসে মানুষের কত দম্ভই যে দেখতে হলো, আবার বার্ধক্যে কত ব্যর্থতার ভারে নুয়ে যাওয়ার সাক্ষীও হতে হলো এই একটা জীবনে! দম্ভ সক্ষমকেও মানায় না, আর অক্ষমকে তো হাস্যাস্পদই করে। যে বলে যৌবনের ধর্মই দম্ভ, সে যে সত্যি বলে না, তা কাকে বোঝাই? কাকে বোঝাই যে দম্ভ—তা সে যৌবনেরই হোক, খ্যাতিরই হোক, স্বাস্থ্যেরই হোক, অর্থ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তিরই হোক আর যারই হোক, তার জের জীবন-ভোর মানুষকে বইতে হয়! ইতিহাসের মানুষই তার প্রমাণ, ইতিহাসই প্রমাণ করে দেয় যে, অতীতে যা হয়েছে ভবিষ্যতেও তাই-ই হবে, ব্যতিক্রম যদি দেখি সেটা বাইরের। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতির যেমন কোনও বদল হয়নি, মানুষেরও তেমনি হয়নি কোনও পরিবর্তন, আমরাই যে শুধু যুবক তা নয়, অতীতের মানুষেরও তো যৌবন ছিল। তাদেরও উচ্ছ্বাস ছিল, দম্ভ ছিল। আজকের যুগের এই সুশান্তর মত তারাও বিশ্বজয়ের দম্ভে মেদিনী কাঁপিয়ে দিয়েছিল একদিন।

কিন্তু···

কিন্তু তার চেয়ে গোটা গল্পটাই বলি, শুনুন।

সুশান্ত আমার বহুদিনের বন্ধু। সুশান্ত কুমার সান্যাল। এক-কালে সুশান্ত সান্যাল বললে লোকে চিনতে পারতো। তার নাম-ডাক ছিল। কাগজের পুজো-সংখ্যাগুলোতে গল্প-উপন্যাস লেখবার জন্য তার কাছে তাগাদা আসতো। তার বই বিক্রী হতো। কেউ কেউ বলতো শরৎচন্দ্রের পর সুশান্ত সান্যালই আগামী কালের ভাবী লেখক। নানা জায়গা থেকে তার কাছে চিঠিপত্তর আসতো। স

চিঠি সে নিজে উত্তর দিতে পারতো না, তাই চিঠি লেখবার জন্যে তাকে লোকও রাখতে হয়েছিল। কেউ অভিনন্দন জানাতো। কেউ স্তুতি জানাতো। কলেজের প্রফেসররা তার সাহিত্যের ওপরে প্রবন্ধ লিখতো। তার গল্প-উপন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা করতো। কাগজে কাগজে তার ছবি ছাপা হতো। দু'একবার জীবনীও তার বেরিয়ে গেছে। সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক হিসেবেও তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

একবার মহাড়ম্বরে তার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পূর্তি উপলক্ষ্যে বরানগরের অধিবাসিরা তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। তার চারিদিকে অসংখ্য ভক্ত শিষ্যদের ভীড় জমেছিল।

মনে আছে, সুশান্ত সেদিন লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিল। সে যে কত বিনয়ী, সে যে কত মহৎ, সে যে কত জ্ঞানী, সে যে কত মানুষের সুখ-দুঃখ-কামনা-আনন্দ-বেদনার কত বড় শরিক তা অন্য লোকের সঙ্গে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। জীবনে যে বড় হওয়া বড় কথা নয়, সকলের সঙ্গে সকলের সব অনুভূতি সমান ভাবে ভাগ করে ভোগ করাই চরম মনুষ্যত্ব, সেদিন তার বক্তৃতায় সেই কথাই সে নানা ভাবে রসালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সে আরো বলেছিল—আপনারা যে ফুলের মালা আমাকে আজ দিলেন, সে মালা আমি তাঁরই গলায় পরিয়ে দিলাম, যিনি সর্বংসহা, যিনি পরম কারুণিক, যিনি মানুষের সব সুখদুঃখ আত্মসাৎ করে অবাঙ্‌মনসগোচর হয়ে বিরাজ করছেন।

সুশান্তর বক্তৃতা শুনে, মনে আছে, আমার চোখে জল এসেছিল। মনে হয়েছিল একে তো আমি চিনি না, এই সুশান্ত সান্যাল। প্রতি-দিনের যে সংসারী মানুষটা আমার বন্ধু, তার মধ্যেকার লেখক মানুষটা যেন আমার নাগালের বাইরে। মনে হয়েছিল, আমি ধন্য যে সুশান্ত আমার বন্ধু। আরো মনে হয়েছিল, যে সুশান্ত সংবর্ধিত হচ্ছে সে সুশান্ত শুধু আমার নয়, সকলের। আমি তাকে যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান দিই সে-ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধার ঠিক সবটা যেন

সুশান্তর কাছে গিয়ে পৌঁছয় না, তার ভক্ত শিষ্যরা সবাই তা ভাগ করে ভোগ করে। আগে সুশান্ত ছিল আমার একার বন্ধু, পরে সেই সুশান্ত হয়ে গেল সকলের প্রিয়। বিখ্যাত হবার পর থেকে সে আর আমার একলার রইলো না, হয়ে গেল জনসাধারণের।

আমি তখন মানুষ হিসেবে তার কাছে কিছুই নই। সে খ্যাতির শিখরে উঠলেও আমি তখনও অজ্ঞাতকুলশীল। কিন্তু তার জন্যে আমার কোনও খেদ বা ক্ষোভ ছিল না। কারণ সুশান্তকে আমি ভালবাসতাম। তাকে যখন সবাই প্রশংসা করতো আমি যেন তার প্রশংসার ভাগ পেতাম। মনে হতো আমি বিখ্যাত নাই-বা হলাম, সুশান্ত তো আমার বিখ্যাত বন্ধু। তার খ্যাতিতে আমার খ্যাতি, তার গৌরবে আমারও গৌরব।

সেই সুশান্ত সান্যালই হঠাৎ একদিন লেখা ছেড়ে দিলে।

বাংলাদেশে লেখক অবশ্য অনেক উঠেছে, পড়েছে। শরৎচন্দ্রের পর অন্তত পঞ্চাশ জন খ্যাতিমান লেখকের এই-ই পরিণতি। এক কালে তাদের বই লোকে পড়েছে, তাদের সাহিত্য-সভার সভাপতি করেছে। আর তারপর আস্তে আস্তে যখন নাম পড়ে গেছে, তখন সবাই তাদের ভুলে গেছে।

কিন্তু সুশান্তর কথা আলাদা। খ্যাতির শিখরে উঠেই সে হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিলে। আর তারপর আজ কত বছর কেটে গেল, কোনও লেখা তার কোথাও ছাপা হয়নি, কোনও বই ছাপা হয়ে বেরয়নি, সেই সুশান্ত সান্যালকে বাংলার পাঠক-পাঠিকারা নিঃশব্দে ভুলে গেছে। আজকালকার পাঠক-পাঠিকা তো তার নামই শোনেনি, অথচ সে এখনও এই কলকাতা শহরে বেঁচে আছে, বেকার হয়ে বার্ধক্যের জ্বালায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ কেন হলো? এ কেমন করে হলো?

সুশান্ত ছেলেবয়েসে বলতো—জীবনে কেউ তোর কথা শুনবে না, কেউ তোকে সাধবে না, তবু সকলকে তোর কথা শোনাতে হবে।

সকলকে তোর নিজেকে জানাতে হবে।

আমি বলতাম—কার এত দায় পড়েছে আমার কথা শুনতে? আমি কে?

সুশান্ত বলতো—কেউই কিছু নয়। জন্মেই কেউ কিছু হয় না—বড় হয়ে সকলকে কিছু হতে হয়। শুরুতে সবাই শূন্যই থাকে, পরে পূর্ণ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—পূর্ণ হবো কী করে?

সুশান্ত বলতো—আত্মপ্রকাশ করে।

—আত্মপ্রকাশ করবো কী করে?

সুশান্ত বলতো—মানুষ নানা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। কেউ গান গেয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, কেউ ছবি এঁকে, কেউ বা গল্প-কবিতা উপন্যাস লিখে, আবার কেউ বা ভাল জামা-কাপড় পরে কিংবা ঘরবাড়ি সাজিয়ে।

তারপর একটু থেমে বলতো—জানিস, নিজেকে প্রকাশ করবার সবচেয়ে ভালো পথ হলো সাহিত্য। যারা সাহিত্যিক তারা মারা যাবার পরও তাদের বই-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান থাকে। সেই জন্যেই তো সাহিত্যিক হবার আমার এত ইচ্ছে। আমি লোকের মনে চিরকাল বেঁচে থাকতে চাই, আমি অমর হতে চাই মানুষের মর-জগতে।

এ-সব ছোট বেলাকার কথা।

ছোট বেলাকার কল্পনায় আমরা কত স্বর্গে চড়েছি, কত নরকে নেমেছি, কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সে-সব দিনের কথা সুশান্তর মনে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে আছে। সেদিনকার প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত আজও মনে করতে পারি।

সুশান্তরা খুব গরীব ছিল। আমাদের চেয়েও গরীব। এক-একদিন ভাত খেতে পেতো না সুশান্ত। তখনকার সস্তাগণ্ডার

দিনেও ভালো জামা-কাপড় জুটতো না তার। অনেকদিন সে আমার বাড়িতে এসে আমার জলখাবারের ভাগটা খেয়েছে। আমার জামা-কাপড় জুতো তাকে পরতে দিয়েছি, সে নির্বিকার মনে তা নিয়েছে। তার জন্যে কখনও তাকে আমার চোখে ছোট হতে হয়নি। বরং বরাবর সে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে আগেকার মতই বড় বড় উপদেশ দিয়েছে, মহৎ লোকের জীবনী শুনিয়েছে আর আমাকে বড় হবার রাস্তা বাতলে দিয়েছে। ঠিক যেমন করে বড় ভাই ছোট ভাইকে নির্দেশ দেয়। অথচ সে আর আমি ছু'জনেই ছিলাম সমবয়সী।

এক-একজন মানুষ থাকে যারা ছেলেবেলা থেকেই পরের ওপর গুরুমশাইগিরি করে। সুশান্ত ছিল সেই জাতের।

আমি তাকে বড় বলেই সম্মান দিতাম, শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম।

সেও বরাবর তার সুযোগ নিয়েছিল। সে উঁচু থেকে আমাকে উপদেশ দিতো, নির্দেশ দিতো, আর আমি তার সামনে নিচু হয়েই তার নির্দেশ পালন করতাম।

সে বলতো—তোর কিচ্ছু হবে না—

তার কাছে নিরুৎসাহ পেয়ে আমি কিন্তু নিরুৎসাহ হতাম না। আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমতো না তার ওপর। তাকে আরো বেশি করে শ্রদ্ধা করতাম।

আমাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল। সেখানে আমরা মাছ ধরতে যেতাম। বঁড়শিতে ময়দার টোপ দিয়ে ছিপ ফেলতাম জলের ধারে। আর চারা চারা মাছগুলো বঁড়শিতে এসে আটকে যেতো।

সুশান্ত বলতো—পাঠকরাও এই মাছের মত, ভালো টোপ পেলেই তারা গেলে, আর ছেড়ে পালাতে পারে না।

সুশান্তর যে সাহিত্য সম্বন্ধে এত জ্ঞান হয়েছিল তার কারণ,

সেই অল্প বয়সেই সুশান্ত যত পারতো নভেল নাটক গিলতো। তাদের বাড়িতে তার নভেল নাটক পড়ার জন্যে কেউ আপত্তি করতো না। আমিও পড়তাম, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। যে দু'একখানা বই তখন পড়েছিলাম তা ঐ সুশান্তরই কল্যাণে। পুরো বই পড়তে পারতাম না। একটু পড়তে না পড়তেই সুশান্ত কেড়ে নিতো, আর যাদের বই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসতো। কিন্তু আমার বাড়িতে ছিল আলাদা নিয়ম। আমার অভিভাবকদের মতে নাটক নভেল পড়লে ছেলেমেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। মা বলতো—এখন ওসব পড়ো না, ষোল বছর বয়সের আগে ওসব পড়তে নেই।

কিন্তু সুশান্ত ততদিনে নাটক নভেলের পোকা হয়ে উঠেছিল। সে সেই অল্প বয়সেই গল্প লিখতে শুরু করেছিল। লিখতো আর আমাকে দেখাতো।

জিজ্ঞেস করতো—তোর কেমন লাগলো ?

বলতাম—খুব ভালো।

সত্যিই তার লেখা আমার খুব ভালো লাগতো। আমি তার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। আমার কেবল মনে হতো সুশান্তর মত করে আমি কবে গল্প লিখতে পারবো !

সুশান্ত বলতো—পারবি, পারবি, আমার লেখা ভালো করে শোন, তাহলে তুই একদিন আমার মতন লিখতে পারবি।

সুশান্ত নিজের লেখাগুলোর নকল রেখে কাগজের আফিসে পাঠাতো। কিন্তু পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যেই সেগুলো তারা আবার ফেরত পাঠিয়ে দিতো। একটাও ছাপা হতো না।

সুশান্ত বলতো—জানাশোনা না থাকলে সম্পাদকরা কারোর লেখা ছাপায় না।

সুশান্তর কথাতে আমার ধারণা হয়েছিল যে, পত্রিকায় যত লেখা ছাপা হয়, তার লেখকদের সকলের সঙ্গে সম্পাদকদের পরিচয় থাকে।

জিজ্ঞেস করতাম—কিন্তু দূরের, দূরের লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকদের কী করে পরিচয় থাকা সম্ভব

সুশান্ত বলতো—চিঠিপত্তর দিয়ে সম্পাদকদের খোসামোদ করতে হয়, আর খোসামোদে কে না ভোলে ?

আমি বলতাম—তুই খোসামোদ করিস না কেন তাহলে ?

সুশান্ত বলতো—আমি কেন খোসামোদ করতে যাবো ? আমার বয়ে গেছে খোসামোদ করতে। আমার লেখা যখন ভালো, একদিন না একদিন ওদের ছাপতেই হবে। যে-সব লেখা ছাপা হয় তার থেকে তো আমার লেখা অনেক ভালো।

এমনি করেই চলছিল। সুশান্ত হতাশ হয়নি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সে লেখা পাঠিয়ে যেতো, লেখাগুলোও ঠিক সময়ে বুক পোস্টে ফেরত আসতো।

আমি তার ধৈর্য, তার সহ্য ক্ষমতা, তার অমানুষিক পরিশ্রম দেখে অবাক হয়ে যেতাম। মনে মনে ভাবতাম সুশান্ত একদিন বড় হবেই। তখন সুশান্তই ছিল আমার কাছে আদর্শ। ভাবতাম আমিও ষোল বছর বয়েস হবার পর গল্প-উপন্যাস পড়ে কী করে সে সব লিখতে হয় তা শিখবো, আর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাগজের অফিসে সেগুলো পাঠাবো।

মনে আছে, একদিন হঠাৎ সুশান্তর একটা গল্প ছাপা হয়ে গেল। কী একটা কাগজ, এখন নাম মনে নেই, তার ভেতরে দেখলাম সুশান্ত সান্যালের নাম ছাপা হয়েছে, তিন-চার পাতার গল্প।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। গল্পটা আমার আগেই পড়া ছিল। কিন্তু ছাপার অক্ষরে সেটা পড়তে আরো যেন হাজার গুণ ভালো লাগলো। মনে হলো সুশান্ত যেন আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। মনে হলো বাঙলা দেশের লোক তার নাম জেনে

গেছে। সে যেন রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে।

আমি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে হলো রে?

সুশান্ত বললে—শুধু আমার লেখার গুণে। সম্পাদককে আমি একটুও খোসামোদ করিনি। যেমন পোষ্টে লেখা পাঠাতে হয় তেমনি পাঠিয়েছি, আর এই ছাপা হয়েছে। তুই বিশ্বাস কর, সম্পাদকের সঙ্গে আমার একটুও জানাশোনা ছিল না—

বললাম—দেখিস, তোর একদিন আরো নাম হবে ভাই, তখন যেন তুই আমাকে ভুলে যাসনি—

সুশান্ত বললে—ও সব বাজে কথা বলিসনি, জীবনে বড় হতে গেলে সকলকেই ভুলে যেতে হবে। পেছু-টান থাকলে আর বড় হওয়া হবে না।

তা সত্যি, শেষের দিকে সুশান্তর কারুর জন্যেই মায়া দয়া ছিল না। ছোটবেলা থেকে সে যেমন নিজের বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখেছে, বড় হয়েও সে তেমনি অন্য কারো কথা ভাবেনি।

আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু সুশান্ত পাশ করতে পারলো না। খবর বেরোবার পরদিন ওদের বাড়িতে গেলাম। ভাবছিলাম, কেমন করে তাকে মুখ দেখাবো। সে ফেল করেছে, সেটা যেন আমারই অপরাধ।

অথচ তার বিপদের দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো না, এটাও কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, সে তখন নিজের ঘরে গল্প লেখায় মশগুল। আমাকে দেখে আবার সে তার লেখাতে ডুবে গেল।

বললে—তুই বোস, আমি এই পাতাটা শেষ করে নিই—

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমি আবাক হয়ে গেলাম সুশান্তর নির্বিকার ভাব দেখে। জীবনে যারা সুখে দুঃখে নির্বিকার

থাকতে পারে তারাই বোধহয় সংসার-সংগ্রামে জেতে। সুশান্তকে দেখে সেদিন আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল। আমি পাশ করে যেন ছোট হয়ে গেছি সুশান্তর সামনে, এমনি ভাব।

অনেকক্ষণ পরে সুশান্ত পাতাটা শেষ করে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলো।

বললে—আমি ফেল করেছি শুনেছিস তো ?

বললাম—হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। সেই জন্যেই তো তোর কাছে এলাম—

সুশান্ত বললে—পাশ করা ভালো, কিন্তু ফেল করাও খারাপ নয়। তবে জীবনের শেষ-পরীক্ষায় পাশ করাটাই আসল। সেখানে যে পাশ করবে, তারই জিত—তুই পাশ করেছিস বলে তোর ওপর যেমন আমার হিংসে নেই, আমি ফেল করেছি বলে তেমনি আমার নিজের কোনও ক্ষোভও নেই—

এর উত্তরে আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না।

বললাম—না, আমি সে জন্যে তোর কাছে আসিনি, তুই কিছু মনে করবি, সেই জন্যেই এসেছিলাম।

মনে আছে সেদিন তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার কাছ থেকে উপদেশ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। সত্যিই তো, কে বড় কে ছোট তা তো শুরু দেখে বিচার করতে নেই, শেষ দেখে বিচার করতে হয়। সুশান্ত তো শেষ পরীক্ষাতে আমাকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে আমার লজ্জা নেই, কারণ সে আমার চেয়ে সব বিষয়েই বড়।

আজ এতদিন পরে সেদিনকার সুশান্তর কথা ভাবতে গিয়ে কেবল অবাকই হয়ে যাচ্ছি। আজ কোথায়ই বা সে, আর কোথায়ই বা আমি। আজ দু'জনের মধ্যে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের ব্যবধান। আজ সুশান্তকে কেউই চেনে না। আজ আমাকে সভা-সমিতিতে

নিয়ে যাবার জন্যে কাড়াকাড়ি, আমাকে সংবর্ধনা দেবার জ
হুড়োহুড়ি।

সুশান্তদের পৈতৃক বাড়ি ছিল। পুরোন ভাঙা বাড়ি হলে
তাদের বাড়িভাড়া দিতে হতো না। একটা অংশে ভাড়াটে ছি
তার ভাড়া থেকেই তাদের সংসার চলে যেতো। সংসারে তারা কেব
দু'জন, সুশান্ত আর তার বুড়ি বিধবা মা। সেই মা জানতো
না ছেলে কত বড় প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, কত বড় সম্ভাব
নিয়ে সংসারে এসেছে।

এর পর থেকে সুশান্তর সঙ্গে আর আমার বেশি দেখা হতো না
আমি নতুন কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজের নতুন বন্ধুবান্ধব নি
মেতে উঠলাম। সুশান্তর কাছ থেকে আমি বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়
গেলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম আমার মন পড়ে থাকতো সুশান্ত
দিকে। যখন একটু সময় পেতাম সুশান্তদের বাড়ি যেতাম। কিন্তু ও
বাড়িতে থাকতো না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কোথায়
থাকতো তা ওর মা জানতো না। সুশান্তর খবরাখবর সম্বন্ধে কেউই
কিছু বলতে পারতো না।

অনেকদিন পরে একদিন কলেজ থেকে আসছি, হঠাৎ দেখা হয়ে
গেল সুশান্তর সঙ্গে। দেখি মধু গুপ্ত লেনের ভেতর দিয়ে সে হেঁটে
হেঁটে চলেছে।

আমি পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকলাম—সুশান্ত—সুশান্ত—

সুশান্ত পেছন ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে—তুই এখানে?

বললাম—কলেজ থেকে ফিরছি, তুই এদিকে কোথায়?

সুশান্ত সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আয়, আমার সঙ্গে
আয়—

বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

তারপর আমাকে নিয়ে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।
সেখানে গিয়ে ডাকলো—কাকীমা, ও কাকীমা—

ভেতর থেকে মেয়েলি গলার আওয়াজ এল—কে ? সুশান্ত ?

সুশান্ত বললে—হ্যাঁ কাকীমা, আমি—

দরজা খুলে যেতেই দেখলাম একজন মহিলা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে াছে। বেশ ধবধবে ফরসা শাড়ি, হাতে কানে সোনার গয়না।

বললে—এ কে বাবা ? একে তো চিনতে পারছি না ?

সুশান্ত ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—এ আমার বন্ধু, এক সঙ্গে াড়েছি আমরা—

—এসো—এসো—

বলে মহিলাটি ভেতর দিকে চলতে লাগলো। আমরাও পেছন পছন চলতে লাগলাম। ছোট এক-তলার একফালি ভাড়াটে াড়ি।

আমাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালে। তারপর হিলাটি কাকে ডাকতে লাগলো—পাখী, ও পাখী—

ডাক শুনেই কোথা থেকে একটা মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে রে ঢুকলো।

—ওমা সুশান্তদা, তোমার এত দেরি হলো ? আমি তখন থকে গা ধুয়ে বসে আছি।

তারপর আমার দিকে নজর পড়াতে বললে—এ কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো সুশান্তদা ?

পাখীর মা বললে—তোরা বোস্, আমি আসছি—

আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। সেকেলে পুরোনো াড়ি, চারদিকে মোটা দেওয়াল। জানালা দুটো তারের জাল দিয়ে াঁটা। বাইরে থেকে হাতবাড়িয়ে কেউ যাতে চুরি না করতে পারে। ানে হলো দিনের বেলাতেও আলো না জ্বাললে এ ঘরে কিছু দেখা ায় না। ঘরময় জিনিসপত্র ভর্তি। বাক্স তোরঙ্গ একটার ওপর একটা বসানো। তার ওপর শাড়ির পাড় দিয়ে তৈরী ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। একদিকে বোম্বাই খাট। খাটের ওপর আধ হাত পুরু

গদি। তার ওপর সাদা চাদর পাতা। বিছানার ওপর দুটো মাথা বালিশ, দু'টো পাশ-বালিশ। দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানে কার্পেটের ছবি—শিবলিঙ্গ। ছবির নিচে কার্পেটের ওপর লাল সুতে দিয়ে লেখা—'ওঁ শিবায় নমঃ'।

পাখী খিলবিল করে কী বলছিল, তা আমার কানে যায়নি আমি এমনিতেই লাজুক মানুষ, ঘটনাচক্রে আরো আড়ষ্ট হে পড়েছিলাম। বিরাট পাখার তলায় বসেও যেন ঘামছিলাম আমার মনে হচ্ছিলো আমি কেন এখানে এলাম? এরা সুশান্তঃ কে? এরা সুশান্তর কী-রকম কাকীমা? এদের কথা কই তে কখনও সুশান্তর মুখে শুনিনি? ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো বিধবা। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কিন্তু মুখে পান, হাতে কানে সোনার গয়না, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই সধবার মত।

আর এ পাখীই বা এমন কোরে সুশান্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলো কী করে?

যখন খেয়াল হলো তখন দেখি সুশান্ত পকেট থেকে একটা টাকা বার করে পাখীকে দিলে।

বললে—তোমাদের ঝিকে দিয়ে একটাকার মিষ্টি নিয়ে এসো তো—

পাখী নির্বিবাদে টাকাটা নিয়ে উঠলো।

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী মিষ্টি খেতে তোর ভালো লাগে?

আমি বললাম—আমি এখন কিছু খাবো না, আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না—

সুশান্ত বললে—দূর, তা কি হয়? কিছু তো তোকে খেতেই হবে, নইলে যে কাকীমা রাগ করবে—

তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই পাখীকে বললে—তুমি যাও, চারটে রসগোল্লা আর চারটে সন্দেশ নিয়ে এসো—

তারপরে কী ভেবে নিয়ে আবার একটা একটাকার নোট বার

করলো। তারপর সে-টাকাটা পাখীর হাতে দিয়ে বললে—তুমি এ টাকাটাও নাও, আটটা রসগোল্লা আটটা সন্দেশ নিয়ে এসো, তুমিও খাবে কাকীমাও খাবে—

আর কোনও কথা না বলে দুটো টাকা নিয়ে পাখী তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তি পেলাম। যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

আমি সুশান্তকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম—এরা তোর কে ?

সুশান্ত কিন্তু তার আগেই আমার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী রকম দেখলি ?

সুশান্তর মুখের চেহারা দেখে আমার অবাক লাগলো। তার হাসিটার স্পষ্ট অর্থ বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এরা কে, তোর কে হয় ?

সুশান্ত নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলে—আমার কাকীমা, আমার কাকীমা—

আর এই মেয়েটা ? পাখী ?

সুশান্ত বললে—পাখী তো আমার বোন—

আমি অবাক হয়ে বললাম—কিন্তু তোর তো কাকা কাকীমা কখনও ছিল না ! তোর খুড়তুতো বোনের কথাও তো কই কখনও তোর মুখ থেকে আগে শুনিনি !

সুশান্ত হাসলো।

বললে—আরে দূর, একি আমার সাত কুলের কাকীমা ? এ হলো পাড়াতুতো কাকীমা—

বললাম—এদের সঙ্গে আলাপ হলো কী করে ?

সুশান্ত বললে—এমনি ঘুরতে ঘুরতে। গল্প লেখার জন্যে সারা কলকাতাই তো ঘুরে বেড়াই, যেখানে যা মালমশলা পাই খাতায় নোট করে রাখি, পরে লেখার কাজে লাগবে।

বললাম—এর জন্যে তোর তো টাকাও খরচ করতে হয় দেখছি।

—তা, টাকা খরচ না করলে চলে? বিনা পয়সায় কি দুনিয়ায় মাল পাওয়া যায়?

আমি বললাম—এদের সংসারে আর কে আছে?

সুশান্ত বললে—আর কে থাকবে, এই মা আর মেয়ে।

—এই পাখীর বাবা নেই?

সুশান্ত বললে—বাবা কাকা জ্যাঠা মেসো কেউই নেই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তা এদের সংসার চলে কী করে?

সুশান্ত বললে—এই আমিই চালাই। আর তা ছাড়া কলকাতার আরো অনেক ইয়াংম্যান আছে, তারা চালায়—

—বাড়িভাড়া কত?

সুশান্ত বললে—ত্রিশ টাকা। তার মধ্যে আমি ওয়ান থার্ড দিই—

আমি বললাম—আর এই সংসার-খরচ—ধোপা, চাল, ডাল, তেল, লেখাপড়ার খরচ?

সুশান্ত বললে—মোটমাট এদের জন্যে মাসে আমার তিরিশ-চল্লিশ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু তাতে আমার লোকসান নেই। আমি এই সমস্ত লোকসানটা বই লিখে উসুল করে নেবো।

বললাম—এই পাখীর বিয়েও দিতে হবে তোকে?

সুশান্ত বললে—দূর, বিয়ে দিলে তো আমার গল্প গাছে উঠবে। বিয়ে যদ্দিন না হয় তদ্দিনই তো আমার খোরাক। বিয়ে হয়ে গেলে তো আমি এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেবো, তখন আর গপ্‌পো হবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। সুশান্তকে দেখে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা হলো। গল্পের প্লটের জন্যে এই রকম পরিশ্রম না করলে কী আর শরৎ চাটুজ্যের মতন লেখক হওয়া যায়?

হঠাৎ হু' কাপ চা নিয়ে কাকীমা ঘরে ঢুকলো।

বললে—চা খেয়ে নাও বাবা তোমরা, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

সুশান্ত বললে—আগে মিষ্টি খেয়ে চা খাবো কাকীমা, পাখীকে মিষ্টি আনতে বলেছি—

কাকীমা বললে—ওমা মিষ্টি, তা হলে সিনেমায় আর কখন এরা যাবে ?

সুশান্ত বললে—এ আজকে প্রথম এল, সেইজন্যে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলাম আর কি।

এমন সময় হঠাৎ পাখী ঘরে ঢুকলো।

কাকীমা বললে—এত ?

সুশান্ত রেকাবিটা পাখীর হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—তোর ভাগে চারটে মিষ্টি তুলে নে, এটা নিজের বাড়ি মনে করবি, এই কাকীমা আমার নিজের কাকীমার মত, বুঝলি—

তারপর নিজের মিষ্টি ক'টা হাতে তুলে নিয়ে রেকাবিটা কাকীমার দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এটা নাও কাকীমা।

কাকীমা রেকাবিটা হাতে নিয়ে বললে—আমাদের জন্যে আবার মিষ্টি কেন আনালে বাবা, এই টাকাটা হাতে থাকলে বরং কাজে লাগতো—

সুশান্ত রসগোল্লা চিবোতে চিবোতে বললে—কেন, পেটে খেলে কী নষ্ট করা হলো ?

কাকীমা বললে—কালকে রেশন তোলার তারিখ, তা জানো—

—কিন্তু, সেদিন যে একটা দশটাকার নোট দিয়ে গেলাম ?

কাকীমা বললে—ওমা, তার মধ্যে সাড়ে সাত টাকা তো রেশন আনতেই বেরিয়ে গেছে। বাকী থাকে আড়াই টাকা, তার থেকে দেড়

টাকা গেছে পাখীর সিল্কের শাড়িটা কাচাতে। বাকী থাকে এক টাকা, সেই এক টাকার মধ্যে আজকে পাঁচশো আলু এনেছি, বাকী রয়েছে আট আনা। সেইটেই এখন পুঁজি—

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখেছিস কী রকম হিসেবী কাকীমা আমার—

ততক্ষণে পাখী দু' গেলাস জল দিয়ে গেছে। সুশান্ত জলটা খেয়ে হাত ধুয়ে আবার পকেট থেকে ব্যাগ বার করলে। ব্যাগ থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে কাকীমার হাতে দিয়ে বললে—এ মাসে আমার অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে—

কাকীমা নোটটা ভাঁজ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে—তুমি খুব খোরচে ছেলে বাবা, একটু দেখেশুনে খরচ না করলে আজকাল-কার দিনে চলবে কী করে? এই গেলো মাসেই পাখীকে এক জোড়া জুতো কিনে দিয়েছো, আবার এ মাসে শাড়ি কেনার কী দরকার ছিল? ও ঠিক তোমার মত অবুঝ হয়েছে, কোত্থেকে টাকা আসে তা তো ও জানে না, ভেবেছে তোমার বোধ হয় টাকার গাছ আছে—

কথাগুলো বলে কাকীমা খালি কাপ প্লেট নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সুশান্ত পাখীকে বললে—কী হলো? কাকীমা যেন ক্ষেপে গেল হঠাৎ?

পাখী বললে—মা তো বরাবর ক্ষেপেই থাকে, তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, চলো বেরুই—

আমিও সুশান্তর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলাম।

পেছন থেকে কাকীমা ছুটে এল—কী বাবা, বেরোচ্ছ? আজ রাত্রিতে তোমরা খাবে নাকি এখানে?

সুশান্ত বললে—না—আজ বাইরেই খেয়ে নেবো—

বাইরে এসে সুশান্ত হঠাৎ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—তোর কাছে এই টাকা ক'টা রাখ তো—

বলে কয়েকটা টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলে। গুনে দেখি পাঁচটা এক-টাকার নোট।

সুশান্ত বললে—তোর কাছে আর কিছু আছে?

বললাম—টাকা দুয়েকের মত আছে—

সুশান্ত বললে—চল, ওতেই হয়ে যাবে—

ততক্ষণে পাখী পেছন থেকে আমাদের সঙ্গে এসে মিললো। চারদিকে চেয়ে দেখলাম মধু গুপ্ত লেনের বাসিন্দারা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। আমার লজ্জা করতে লাগলো। মনে হলো ওরা যেন আমাকেও এদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে। ভেবেছে আমিও এই মেয়েটার পেছনে টাকা খরচ করতে এ-বাড়িতে জুটেছি।

তাড়াতাড়ি সুশান্তদের এড়াবার জন্যে বললাম—আমি তাহলে চলি ভাই—

সুশান্ত আমার হাতটা খপ করে ধরে ফেলেছে। বললে—সে কী রে, কোথায় যাবি? তোর কোনও কাজ আছে নাকি?

—না, কাজ তেমন কিছু নেই—

—তবে? চল—

পাখী বললে—চলুন না, আপনার আপত্তি কিসের?

ওদের পীড়াপীড়িতে ওদের সঙ্গেই চলতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবি তোরা?

সুশান্ত বললে—এমনি বেড়াচ্ছি, যেদিকে দু'চোখ যায় ঘুরবো—

পাখী বললে—চলো না নিউ-মার্কেটে যাই—

সুশান্ত বললে—নিউ-মার্কেট যে আজ বন্ধ—

—বন্ধ? কেন?

সুশান্ত বললে—একে জিজ্ঞেস করো না, ওদের স্ট্রাইক্ চলছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে চুপি চুপি আমার গা টিপতে লাগলো। বললে—কী রে, তুই বল না, ওদের স্ট্রাইক চলছে না?

নিউ-মার্কেটে আজ স্ট্রাইক্ চলছে কি না তা জানতুম না। নিউ-মার্কেটে আমার তেমন নিয়মিত গতিবিধিও নেই। আমি শহরতলীতে থাকি, কলেজে যাই, আর বাড়ি ফিরে এসে বই-খাতা নিয়ে পড়তে লিখতে বসি। আমি গরীবের ছেলে। নিউ-মার্কেটের খবর রাখার দরকারও হয় না আমার। আমি পাড়ার বাজারেই বাজার করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সুশান্তকে আমার গা টিপতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। মনে হলো আমি সুশান্তর কথায় সায় দিই এইটেই সুশান্ত চায়।

সুশান্ত বললে—কী রে, তুই তো জানিস নিউ-মার্কেটের স্ট্রাইক্ চলছে ?

পাখী বললে—তার চেয়ে চলো সুশান্তদা, হাতিবাগানের বাজারে যাই, ভেতরে খুব ভালো ভালো দোকান আছে—

—ওরে বাবা—

যেন সাপ দেখে লাফিয়ে উঠেছে সুশান্ত! বললে—ওরে বাবা, হাতিবাগানের মার্কেটে গেলে দম আটকে মারা যাবো—

পাখী বললে—তা'হলে কোথায় যাবে ?

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁরে, তুই বল না কোথায় যাওয়া যায় ?

বলে আবার আমার গা টিপতে লাগলো।

আমি ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে বললাম—তার চেয়ে চল না ফাঁকা পার্কে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে গল্প করি—

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে—ওমা, আপনিও সুশান্তদার মত কবি নাকি ?

সুশান্ত আমার হয়ে উত্তর দিলে—আরে হ্যাঁ, কবি না হলে আমার বন্ধু হয়, এককালে আমার মত ওর লেখাও কাগজে ছাপা হবে।

আমি কিছু উত্তর দিলাম না। পাখীও আর কিছু বললে না।

আমি লিখি বলে পাখী যে আমাকে বেশি শ্রদ্ধা করলে তাও মনে হলো না।

তাড়াতাড়ি সামনে একটা বাস আসতেই সুশান্ত তাতে টপ করে উঠে পড়লো। পাখী আর আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। কে আগে নামতে-উঠতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। পাছে হারিয়ে যায় তাই পাখী একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা জাপটে ধরলে। ঠেলাঠেলির বিরাম নেই। হঠাৎ ভেতর থেকে সুশান্তর গলার আওয়াজ এল—কই রে, চলে আয়—

শেষকালে কোনও উপায় না পেয়ে ঠেলেঠুলে পাখীকে বাসের পা-দানির ওপর তুলে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ততক্ষণে বাস ছেড়ে দিয়েছে।

সুশান্ত বললে—কী রে, বাসে ওঠবার টেকনিক্ জানিস না? এক্ষুনি তো এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতো।

পাখী সারা রাস্তা গজগজ করতে লাগলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখলেন তো আপনার বন্ধুর কাণ্ডটা? এ রকম করে হা-ঘরেদের মতন ট্রামে-বাসে চড়া অভ্যেস নেই আমার—সবাই আমায় ট্যাক্সি করে চড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই জন্যই তো আমি সুশান্তদার সঙ্গে বেরোতে চাই না—।

আমি আর এর উত্তরে কী বলবো! শ্যামবাজারের মোড়ে এসে নামলাম সবাই। সেখান থেকে দেশবন্ধু পার্ক। একটা নিরিবিলি কোণ দেখে তিনজনে বসলাম।

সুশান্ত বললে—দেখছো, কী রকম নিরিবিলি জায়গা, কাম্ এ্যাণ্ড কোয়াএট্—এখানে এলে হেল্‌থ্ ভালো হয়ে যায়, এমন ফ্রেশ্ এয়ার—

পাখী বললে—ফ্রেশ্ এয়ার খেয়ে আর ছাই হবে, যারা বুড়ো হাব্ড়া মানুষ তারা ফ্রেশ্ এয়ার খাবে, আমাদের নিউ-মার্কেটই ভালো—

সুশান্ত বললে—নিউ-মার্কেট তো ভালো হবেই তোমার কাছে,

সেখানে যে রূপ দেখানো যায়, সেখানে যে শাড়ি গয়না খোঁপা দেখানো যায়—

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা বলুন তো, কেউ যদি না-ই দেখলো তো শাড়ি গয়নার দরকারটা কী ?

সুশান্ত বললে—কেন, আমরা তোমাকে দেখবো আর তুমি আমাদের দেখবে ?

—আজকে সন্ধ্যেটাই মাটি !

সুশান্ত বললে—অন্যদিন তো মাটি হয় না, আজকে একটা সন্ধ্যে মাটি হলোই বা—

পাখী বললে—তার চেয়ে চলো কোনও রেস্টুরেণ্টে ঢুকি, তুমি তো মাকে বলেই এলে আজ বাইরে খেয়ে নেবে ।

সুশান্ত বললে—এরই মধ্যে তোমার ক্ষিদে পেয়ে গেল ? এই তো সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালুম । কী রে, তোর ক্ষিদে পেয়েছে ?

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলে—

আমি বললাম—না—

—ঐ দেখো, ওর ক্ষিদে পায়নি, আমারও ক্ষিদে পায়নি ! আমার সঙ্গে আসবার দিনই তুমি কী সকাল থেকে উপোষ করে থাকো ?

মনে আছে, সেদিন বাধ্য হয়েই সুশান্ত আমাদের তু'জনকে নিয়ে একটা রেস্টুরেণ্টের ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল । আমি বুঝতে পারছিলাম সুশান্ত বেশি টাকা খরচ করতে চাইছিল না, আর পাখীও সুশান্তর টাকা খরচ করতে চাইছিল ।

সুশান্ত আমাকে জিজ্ঞেস করলে—তুই কী খাবি রে ?

বললাম—আমার ক্ষিদে নেই ।

সুশান্ত বললে—আমারও ক্ষিদে নেই ভাই —

তারপরে পাখীর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী খাবে—

বয়টা অর্ডার নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল।

পাখী বললে—যা-হোক কিছু আনুক—একটা 'ফাউল কাটলেট, আর একটা ব্রেস্ট কাটলেট দাও, সঙ্গে স্যালাড দেবে। কিন্তু তোমরা কেউই কিছু খেলে না, আমার একলা খেতে বড় খারাপ লাগছে—

সুশান্ত বললে—তার সঙ্গে ফাউলকারি নাও-না।

পাখী বললে—ত্বটো কাটলেট নিলাম তার ওপর আবার কারি ?

সুশান্ত বললে—তাতে কী হয়েছে, তোমার খিদে পেয়েছে খেয়ে নাও—একটা পুডিংও নাও—

তারপরে বয়টার দিকে চেয়ে বললে—যাও, একটা ফাউল কাটলেট, একটা ব্রেস্ট কাটলেট, এক ডিস ফাউলকারি—আর একটা পুডিং নিয়ে এসো।

তখনও জানি না সুশান্ত আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এত কাণ্ড করছে। কিন্তু আমি তো জানি আমি কেউই নই। সুশান্ত আমার বন্ধু, সে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে বলেই এসেছি। আমার কোনও দায় নেই, দায়িত্বও নেই। বলতে গেলে সুশান্তই এই নাটের গুরু, আর পাখী হলো লক্ষ্য। আমি কিছুই নই, এমন কি উপলক্ষ্য মাত্রও নই। আমি শুধু বাড়তির ভাগ হয়ে এদের মধ্যে উপস্থিত আছি। আর কিছুই নয়।

পাখী খাচ্ছে। আমরা ত্ব'জন সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে গল্প করছি।

পাখী বললে—ফাউলকারিটা খুব ভালো করেছে সুশান্তদা, বেশ টেস্ট হয়েছে। তোমরা একটুও খেলে না কেন ?

আমাদের সামনে বসে খেতে হয়তো পাখীর লজ্জা হচ্ছিলো। কিন্তু পেটে ক্ষিধে থাকলে লজ্জা করে কোনও লাভ নেই, তাই সে গোগ্রাসে খেয়ে চলছিল।

কারির সঙ্গে ত্ব'পিস পাঁউরুটি দিয়ে গিয়েছিল বয়টা। সেটা শেষ করার পরই ফাউল কাটলেট দিয়ে গেল।

পাখীর খাওয়া দেখে আমার মনে হচ্ছিলো সে যেন অনেকদিন ধরে ভালো করে পেট ভরে খেতে পায়নি। ফাউলকারির প্লেটটা পাশে সরিয়ে দিয়ে ফাউল কাটলেটের প্লেটটা সামনে টেনে নিলে। তারপর শিশি বোতল থেকে খানিকটা মাস্টার্ড পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাতে কাঁটাচামচে ধরলে।

সুশান্ত বললে—ওই যাঃ—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, বাগবাজারে একজনের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল, আমি এখুনি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসছি—

বলে উঠে দাঁড়ালো।

সুশান্তর কথা শুনে আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেছি। পাখী আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললাম—সে কী, এখনই না গেলে নয়?

সুশান্ত বললে—না, খুব জরুরী কাজ—

জিজ্ঞেস করলাম—কত দেরি হবে?

সুশান্ত বললে—এই যাবো আর আসবো, আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না—

অগত্যা সুশান্ত চলে গেল। আমি আর কী করবো, বসে রইলাম।

পাখী খাচ্ছিলো তখনও। বললে—দেখলেন তো আপনার বন্ধুর কাণ্ড, এখন কখন আসে কে জানে!

আমি বললাম—হয়তো কোনও কাজ পড়েছে—

পাখী বললে—হাজার কাজ থাকলেই বা, এটাও কি একটা কাজ নয়?

—লেখক মানুষ, কাজে ভুল হয়ে যায় বোধহয়—

পাখী তখন ব্রেস্ট কাটলেট খাওয়া শেষ করে পুডিংটা নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে।

বললে—আপনিও বুঝি লেখেন?

আমি বললাম—না, আমি ওর সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি, আমি ওর মত লিখতে পারি না।

পাখী বললে—লিখে কী হয়? লেখা কেউ পড়ে?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনি রবিঠাকুরের বই পড়েননি?

পাখী বললে—না, লিখতে পড়তে আমার ভালো লাগে না।

আমি বললাম—আপনি কারোর বই-ই পড়েননি? শরৎ চ্যাটুজ্জের বই?

—পড়তে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভালো লাগেনি। আমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে, কেবল মনে হয়, যদি সিনেমায় নামতে পারতুম তো ভালো হতো। আপনার সঙ্গে কোনও সিনেমা ডাইরেক্‌টারের আলাপ আছে?

বললাম—না!

—সুশান্তদার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে। সুশান্তদা একদিন আমায় স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিল জানেন। সুশান্তদা সিনেমার গল্প লিখবে বলেছে—

বললাম—জানেন, ও-সবে না যাওয়াই ভালো। ও-লাইনে ছেলেমেয়েদের চরিত্র ভালো থাকে না—

পাখী বললে—কিন্তু টাকা? সিনেমায় যারা নামে তারা কত টাকা উপায় করে বলুন তো? কত নাম হয়, চারিদিকে কত ছবি ছাপা হয়, গাড়ি-বাড়ি সব হয় সিনেমায় নামলে—

বললাম—তোমার মা তাতে রাজী হবে?

পাখী বললে—টাকা পেলে কে না রাজী হয়! আমি বেশি টাকা উপায় করলে মা'রই তো লাভ। আমার টাকা তো মা-ও ভোগ করবে।

আমি বললাম—সুশান্তর কি এ ব্যাপারে মত আছে?

পাখী বললে—কেন থাকবে না? আজকাল কত মেয়ে অফিসে,

ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে চাকরি করছে, আর সিনেমাতেই কাজ করলে দোষ হয়ে গেল ?

আমি বললাম—তা সিনেমার চাকরি আর অফিসের চাকরি কি এক ?

পাখী বললে—এক তো নয়ই। অফিসের চাকরিতে মাস গেলে একশো-দেড়শো টাকা মাইনে, আর সিনেমাতে হাজার হাজার টাকা আর সিনেমা যদি খারাপই হবে তো সিনেমা-জগতের ছবি অত বড় বড় করে খবরের কাগজে ছাপা হয় কেন ? তাদের পদ্মশ্রী টাইটেলই বা দেয় কেন ?

এ কথার আর কী উত্তর দেবো, তাই চুপ করে রইলাম। সত্যিই তো, পাখীর কথার অকাট্য যুক্তি। আমি অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না। সিনেমাতে যাদের নাম-ধাম হয়েছে তাদের কথাই পাখী জানে। কিন্তু কত অসংখ্য ছেলেমেয়ে অতল তলে তলিয়ে গেছে তার হিসেব তো পাখী রাখে না। আর শুধু পাখী কেন, জীবন-যুদ্ধে যারা হেরে যায় তাদের কথা মনে রাখবার সময় কারই বা আছে !

হঠাৎ বয়টা ঢুকে খালি প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে—কফি দেবো ?

পাখী বললে—হ্যাঁ—

আমি বললাম—শুধু এক কাপ দিও, আমি খাবো না—

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সুশান্ত চলে যাবার পর দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। অর্থাৎ তখন সাড়ে আটটা। অথচ পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে বলেছিল! শেষকালে সুশান্ত কী আমাকে বিপদে ফেলবে নাকি !

বয়টা এসে এক কাপ কফি পাখীর সামনে রেখে দিয়ে গেল।

পাখী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। আমি এক মনে তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সুশান্তর এতগুলো টাকা মেয়েটা খেয়ে নষ্ট

করছে দেখে আমার খুব রাগ হতে লাগলো। সুশান্ত এমন কিছু বড় লোক নয়। বাড়িভাড়ার আয়, আর লিখে যদি কিছু আয় করে থাকে তো তার ওপর ভরসা করে পাখীর মত এমন হাতি পুষতে গেল কেন! এ মেয়ে তো সুশান্তকে গ্রাস করে ফেলবে! একেবারে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে!

হঠাৎ বয়টা ঘরে ঢুকলো।

বললে—আর কিছু নেবেন আপনারা?

কথাটা সে আমাকে লক্ষ্য করেই বললে। আমি পাখীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু নেবে নাকি?

পাখী বয়টার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আর কী কী আছে তোমাদের?

বয়টা লম্বা লিস্ট বলে গেল মুখে—আরো অনেক জিনিস আছে, ডেভিল, ডিমের কারি, মটন্ দো-পেঁয়াজি, ভেটকি মাছের ফ্রাই, মটন কারি···

বয়টা যত খাবারের লম্বা তালিকা দিয়ে যাচ্ছে, আর ততই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। ভাবলাম পাখী কি আরো খাবে নাকি! সব টাকা তো সুশান্তকেই শোধ করতে হবে, সুশান্তর কাছে যদি এত টাকা না থাকে?

পাখী বললে—সিনেমাতে নামলে দেখবেন আমি রাতারাতি নাম করে ফেলবো। আমি এত সিনেমা দেখি তো, কিন্তু কারো এ্যাক্টিং আমার ভাল লাগে না, আমার এক-একবার মনে হয় কাকে বলে এ্যাক্টিং তা আমি ওদের দেখিয়ে দিই।

বললাম—আমি ঠিক ওসব ব্যাপার জানি না, সিনেমা সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই—

পাখী অবাক হয়ে গেল—সে কী? আপনি সিনেমা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? আপনি দেখছি মানুষ খুন করতে পারেন।

বললাম—যা জানি না সেটা অকপটে আমি স্বীকার করলাম—

পাখী বললে—না-জানাটা আপনার অপরাধ এ যুগে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে যে সিনেমা দেখে না, বা যে সিনেমা সম্বন্ধে জানে না তার আত্মহত্যা করা উচিত। সিনেমা তো একটা বড় আর্ট, এ যুগের সেই আর্টের খবর রাখবো না সেটা উচিত নয়, গল্প-উপন্যাস লিখে লেখকরা ক'টা টাকা পায় শুনি?

বললাম—টাকা দিয়ে লেখককে বিচার করবেন না—

পাখী বললে—টাকা দিয়ে বিচার করবো না তো কী দিয়ে বিচার করবো? এই যে এখানে বসে খাচ্ছি, এও তো সেই টাকা! টাকা না হলে কী খাওয়া-পরা-বাবুয়ানি কিছু চলে? টাকা ফেলুন, দেখবেন সব কিছু আপনার হাতের মুঠোয়! মা যে মেয়েকে ভালোবাসে তাও ঐ টাকার জন্যে। গরীব ছেলেমেয়েকে গরীব বাপ-মা'রাও দেখতে পারে না। স্নেহ প্রেম ভালোবাসা মায়া দয়া মমতা, যে-সব জিনিসের কথা আপনাদের গল্প-উপন্যাসে বড় করে জাহির করেন সে-সবই তো ফাঁকা বুলি।

আমি বললাম—আমি তো এখনও লেখক হতে পারিনি—

পাখী বললে—আপনার কথা বলছি না, আপনার ঐ সুশান্তদার কথা বলছি, আর যেসব বড় বড় লেখক জন্মেছেন—বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জে, রবি ঠাকুর—সব্বাই ভাঁওতা দিয়ে গেছেন, কেউই আসল কথাটা লেখেননি—

জিজ্ঞেস করলাম—আসল কথাটা কী?

পাখী বললে—এক কথায় টাকা! টাকা কী করে কামাতে হয়, কী করে খরচ করতে হয়, টাকা না থাকলে যে সব মিথ্যে হয়ে যায়, এ কথাটা কেউই লিখলো না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—টাকা দিয়ে যে সব কেনা যায় না এ কথা কী আপনি বিশ্বাস করেন না—

পাখী বললে—এই যে এত চপ কাটলেট এখানে খেলাম এর দাম না দিলে কি এরা আমাদের ছাড়বে! সব টাকা গুনে গুনে

আদায় করবে, আমি মিষ্টিমুখে ওদের দিকে চেয়ে হাসলেও আমাদের রেহাই দেবে না।

বললাম—কিন্তু প্রেম ?

পাখী বললে—আপনি আমাকে টাকা দিন, বেশি টাকা দিন, আমি সুশান্তদাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে প্রেম করবো !

বললাম—কিন্তু ধরুন, একজন কোটিপতি কুষ্ঠরোগী লোফার যদি আপনাকে বিয়ে করতে চায় আপনি রাজী হবেন বিয়ে করতে ?

পাখী বললে—কুষ্ঠ রোগ তো দূরের কথা, এক কোটি টাকা কেউ যদি ফেলে আমি মেথরকেও বিয়ে করতে রাজী আছি—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না, আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। পাখীর তখন দো-পেঁয়াজী খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিলো যেন একটা কেউটে সাপের সঙ্গে আমি এক ঘরে বন্দী হয়ে আছি। আমার আরো মনে হচ্ছিলো যদি কোনও দিন বড় হয়ে উপন্যাস লিখতে পারি তো এই পাখীদের নিয়েই লিখবো। এই যারা টাকার জন্যে সব রকম নীচতা, হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ভেবেছিলাম যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন গল্প-উপন্যাস লেখবার ক্ষমতা হয় তো সেদিন সেই সমাজের বিরুদ্ধেই লিখবো যে-সমাজের মানুষ এই পাখী।

পাখী বললে—সুশান্তদাকে আমি বলি ওই সব ফালতু গল্প লিখে লাভ কী, তার চেয়ে সিনেমার গল্প লিখলে অনেক বেশি টাকা হয়। গল্প লিখলে যেখানে আপনারা পাবেন কুড়ি টাকা, সেখানে সিনেমার গল্প লিখলে কম করেও পাবেন দু' হাজার টাকা—এখন কোনটা ভালো, আর কোনটা মন্দ সেটা আপনারাই বিচার করুন—এ তো সোজা হিসেব, এ-হিসেব জানতে গেলে লেখাপড়া জানার দরকার হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম—তা সুশান্ত আপনার কথায় কী বলে ?

পাখী বললে—সুশান্তদা আমার কথা শোনে না, সুশান্তদা বলে সে

সাহিত্যিক হবে। আমি আর কী বলবো, যে নিজের ভালো বুঝবে না তাকে আমি তার ভালো বোঝাবো কী করে? আমি তো বলি একটা এমন গল্প লিখতে যাতে সুশান্তদারও বাড়ি হবে আর আমি তাতে হিরোয়িনের পার্ট করে গাড়ি-বাড়ি নাম-খ্যাতি সব কিছু পাবো। কিন্তু আমার কথা শুনলে তবে তো! সুশান্তদা কেবল যত সব বাজে কথা লিখছে। সুশান্তদা বলে—একটা সাহিত্যিকের লাইফ তিনশো চারশো বছর, আর একটা ফিলিম্-স্টারের লাইফ দশ বছর। আমি শুনে হাসি—

হঠাৎ খেয়াল হলো, কই, সুশান্ত তো এখনও আসছে না! আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবে বলে চলে গিয়েছিল, এখন তিন ঘণ্টা কেটে গেল এখনও তো তার আসবার নাম নেই। আমার হৃৎকম্প শুরু হলো। যদি সুশান্ত না আসে? সুশান্ত না এলে যে কী বিপদে পড়বো তা ভাবতেও আমার ভয় হলো।

বয়টা এসে বিল দিয়ে গেল।

বিলটা হাতে নিয়ে দেখি দাম হয়েছে তের টাকা আট আনা!

আমার তো চক্ষুস্থির!

পাখীর দিকে চেয়ে দেখলাম, সে তখন খাওয়ার পরিতৃপ্তিতে অবসন্ন। আমি কী করবো বুঝতে পারলাম না। শরীরের সমস্ত রক্ত শোঁ শোঁ করে মাথা লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে লাগলো। সুশান্তকে কাছে পেলে হয়তো তখন তাকে খুন করে ফেলতাম। মনের রাগ বাইরে প্রকাশ করতে পারছি না। একবার মনে হলো পাখীকে এই অবস্থায় এখানে একলা ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাই। তখন আর আমার দায়িত্ব থাকবে না। পাখী মুশকিলে পড়ুক, পাখাকে ওরা পুলিশে ধরিয়ে দিক, পাখীকে ওরা জেলে পুরুক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কোথাকার কে পাখী, কোন্ এক মধু গুপ্ত লেনের অখ্যাত অজ্ঞাত মেয়ে, তার সম্মান-অসম্মানের দায় আমি বইবার কে? সে তো আমার কেউ নয়। সুশান্তর সে যে-ই হোক, তার

ভালো-মন্দের দায় আমার হতে যাবে কেন ?

মনে আছে সেদিন আমার যে রকম মানসিক অবস্থা হয়েছিল, সে-রকম আগে আর কখনও হয়নি। আমার কাছে ছিল মাত্র সাত টাকা, আর বিল হয়েছিল সাড়ে তের টাকা। বাকী টাকাটা আমি কোথা থেকে দেবো! হোটেলের মালিক আমাকেও চেনে না, পাখীকেও চেনে না, তারা টাকা বাকী রাখবেই বা কেন ?

পাখী হঠাৎ বললে—সুশান্তদার কথা ভাবছেন ?

বললাম—না, তা ঠিক নয়, মানে···

পাখী বললে—আমার মনে হয় সুশান্তদা নিশ্চয় কোথাও আটকে গেছে। আড্ডাবাজ মানুষ তো, হয়তো আড্ডায় জমে আমাদের কথা ভুলেই গেছে—

বললাম—কিন্তু সে যে বলেছিল কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছে ?

পাখী বললে—ওইটেই তো মানুষটার দোষ। চোখের আড়ালে গেলেই সব ভুলে যায়। যেখানে বসবে সেখানে একেবারে শেকড় গজিয়ে যাবে—

আমি বললাম—কিন্তু তার একটা দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত। আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে সে চলে গেল, অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনিও তো আমাকে ভালো করে চেনেন না—

পাখী বললে—তাতে কী হয়েছে, এখন থেকে আপনার সঙ্গে চেনা হলো। এখন থেকে আপনি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসবেন। এমনি করেই তো সুশান্তদার সঙ্গে একদিন হঠাৎ আলাপ হয়েছিল—

বললাম—আপনার কাছে কিছু টাকা আছে ?

—টাকা ? কেন ?

বললাম—হ্যাঁ, এই দেখুন না, সাড়ে তের টাকা বিল হয়েছে খাবারের, অথচ···

পাখী বললে—আপনার কাছে টাকা নেই ?

আমি বললাম—আছে, কিন্তু মাত্র সাত টাকা, বাকী সাড়ে ছ' টাকা কম পড়ছে—

পাখী বললে—তা'হলে কী করবেন ? আমার কাছে তো কিছু নেই !

বললাম—এরা তো আমাদের চেনে না, এরা কি বাকী রাখবে ?

পাখী কী ভাবতে লাগলো কে জানে ! মনে হলো সে যেন নির্বিকার, তার যেন কোনও দায়িত্বই নেই।

আমি বললাম—এখন কী করি বলুন তো ?

পাখী বললে—আর একটু বসুন না। দেখুন না, সুশান্তদা হয়তো আসতেও পারে—

আমি বললাম—এলে এতক্ষণে এসে যেতো, এখন আর আসবে না—

পাখী বললে—তা'হলে চলুন বাড়ি চলে যাই—

বললাম—কিন্তু এদের কী বলবো ?

পাখী বললে—ধার থাক, টাকা সঙ্গে না থাকলে লোকে কী করবে ?

আমি তখন নিজের মনেই মতলব আঁটছি। আমি পুরুষ মানুষ, আমাকেই চেপে ধরবে। পাখী তো মেয়েমানুষ, মেয়েরা তো আমাদের সমাজে নির্দোষ।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম—চলুন, যা হয় করা যাবে—

বলে পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম—পাখীও আমার সঙ্গে পেছন পেছন বেরিয়ে এল।

হোটেলের মালিক একটা ক্যাশবাক্স নিয়ে দরজার পাশে

বসেছিল। তার কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোককে সুশান্তর কথাও বললাম। সুশান্ত যে আমাদের বসিয়ে খেতে দিয়ে একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে, আর তার কাছেই যে সব টাকা-কড়ি আছে, তাও সবিনয়ে পরিষ্কার করে বোঝালাম। এই অবস্থায় আমার কাছে যে মাত্র সাত টাকা আছে তাও পকেট উপুড় করে দেখিয়ে দিলাম। তারপর যখন সব বলা শেষ হয়ে গেল তখন তার করুণার ওপর আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক সব শুনলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, আমি দান-ছত্র করবার জন্যে এ হোটেল খুলিনি মশাই, আমি ব্যবসা করতে বসেছি। টাকা যখন নেই, তখন এত খেতে গেলেন কেন? টাকা পকেটে না নিয়ে এ-বাজারে কেউ এত খায়? আলুর কিলো পাঁচসিকে, পেঁয়াজ ষাট, বেগুন একটাকা পঞ্চাশ, মানকচু, যে মানকচু খেলে মুখ কুটকুট করে, যে মানকচু ছোটবেলায় থু থু করে ফেলে দিয়েছি, সেই মানকচুর এখন কিলো এক টাকা। আপনি কি বলতে চান আমি আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার টাকা দিয়ে আপনাদের খাওয়াবো? আপনি কি আমার পুষ্যিপুত্তুর না আমার জামাই? টাকা থাকে তো দিন আর না থাকে তো আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

আমি বললাম—অত বাজে কথা শুনতে চাই না, আমরাও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে, বিপদে পড়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইছি। সাত টাকা এখন আপনি নিন, বাকী টাকাটা আমি কাল ভোরবেলায় এসে দিয়ে যাবো—

ভদ্রলোক বললে—দেখুন, ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়ে আমার অনেক দেখা আছে। আমি যেদিন থেকে এই রাস্তায় হোটেল খুলেছি, সেইদিন থেকেই ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েদের দেখে আসছি। ভদ্দর-লোক কী কারোর গায়ে লেখা থাকে? ব্যবহারে ভদ্দরলোক প্রমাণ হয়—

তারপর একটু থেমে বললে—দেখুন, ঐ চেয়ে দেখুন—

আমি তার নির্দেশ মত একটা দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। রঙ-চটা দেওয়াল, একটা আলমারী রয়েছে। তার মাথার দিকে কয়েকটা বাঁধানো মেয়েমানুষের আধন্যাংটা ছবি টাঙানো রয়েছে। আর তারই এক পাশে একটা ফ্রেমে বাঁধানো কাগজের ওপর বড় বড় করে লাল-নীল অক্ষরে লেখা রয়েছে—'আজ নগদ কাল ধার'।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলে—দেখেছেন?

আমি কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন—এই আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েদের জ্বালায় অস্থির হয়েই নগদ সাড়ে চার টাকা দিয়ে ওইটে টাঙাতে হয়েছে—

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের চিৎকারে বেশ ভীড় জমে গিয়েছিল। তারা দোকানে খেতে এসে একটা বাড়তি খোরাক যেন পেয়ে গেছে, এমনি তাদের মুখের চেহারা। বিশেষ করে আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছে বলে ঘটনার গুরুত্বটা যেন তাদের কাছে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

একজন খদ্দের মন্তব্য করলে—আপনারই দোষ মশাই, হোটেল-ওয়ালা তো ঠিকই বলছে। সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে খেতে এসেছেন আর ট্যাঁক গড়ের মাঠ—বলিহারী আপনাদের সাহস মশাই, মেয়েছেলেরা একটু বেশি খায় তা জানেন না!

আর একজন আর এককোণ থেকে ফুট্ কাটলো—না মশাই, আপনি ছাড়বেন না ওদের, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করলে হিসেবের বালাই থাকে না, চেপে ধরুন—

আর একজন বলে উঠলো—গায়ে তো ওনার গয়না রয়েছে, একগাছা চুড়ি খুলে দিলেই হয়—

এতক্ষণে পাখীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল। সে বলে উঠলো—না না, এ সোনার চুড়ি নয়, এ গিল্টী সোনা, বিশ্বাস করুন, আমার গায়ে একটা গয়নাও সোনার নয়।

বলতে বলতে পাখীর মুখখানা কান্নায় ভারী হয়ে উঠলো।

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। দোকানদার ভদ্রলোককে বললাম—ঠিক আছে, আমার আঙুলের এই আংটিটা আপনার কাছে জমা রাখুন, আমি কালকে এসে সাড়ে তের টাকা দিয়ে এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো—

দোকানদার ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম—আপনি কিছু ভাববেন না। এটা সোনার আংটি, সকালের সোনা, আমার বাবার হাতের আংটি এটা, বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি পরছি, আপনি নির্ভয়ে এটা নিতে পারেন। সন্দেহ হলে আপনি কাউকে দিয়ে যাচাই করে নিন, আমি ততক্ষণ বসে আছি।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ ভেবে বললেন—আমি তা বলছি না মশাই, আমি ভাবছি আপনার কথা, আপনার যে সাড়ে তের টাকা গচ্ছা গেল, আপনি তো কিছুই খেলেন না, আমি সব শুনেছি বয়টার কাছে—

বললাম—সে আপনি যা-ই শুনুন কোনও ভয় নেই, এটার অন্তত পঞ্চাশ ষাট টাকা দাম হবেই—

ভদ্রলোক আংটিটা নিয়ে ড্রয়ার খুলে তার ভেতরে রেখে দিয়ে আবার ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলে।

পাখীকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে নেমেছি, হঠাৎ ভদ্রলোক পেছন থেকে ডাকলে—ও মশাই শুনুন—

আমি কাছে যেতেই ভদ্রলোক মাথা নিচু করে চুপি চুপি বললে—আপনি কার পাল্লায় পড়েছেন? আপনাকে দেখে তো মনে হয় আপনি লেখাপড়া জানেন—

আমি বললাম—কেন?

ভদ্রলোক বললে—কিছু মনে করবেন না, আপনার ভালোর

জন্যেই বলছি, ওসব মেয়েছেলেকে নিয়ে কেন ঘোরেন ?

আমি বললাম—ওরা কী রকম মেয়েছেলে তা আপনি কী ক
জানলেন ?

ভদ্রলোক বললে—আমি চিনি না ওকে ? ও তো আমার দোকা
হামেশা আসে, এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে আসে আর তাদে
ঘাড় মটকায়। আপনি অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছেন মশাই, সা
তের টাকার ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেছেন, আপনার ভাগ
ভালো !

তারপর একটু থেমে বললে—এখন তো আবার ওকে ট্যাক্সি ক
বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে ! তা সে টাকা আছে তো ?

বললাম—ঐ সাতটা টাকা আছে—

ভদ্রলোক বললে—ও টাকায় কিছু হবে না, যে-মেয়ের পাল্লা
পড়েছেন, ওর কাছে তা নস্যি, এই আরো দশ টাকার একটা
নোট দিচ্ছি এটা সঙ্গে রাখুন, নইলে আবার কোন্ বিপদে পড়বেন—

বলে ভদ্রলোক একটা দশ টাকার নোট ড্রয়ার থেকে বার ক
আমার হাতে গুঁজে দিলে।

তারপর আবার বললে—যান, কালকে এসে সাড়ে তেইশ টাক
দিয়ে যাবেন, আর আংটিটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন—

আমি আর কী বলবো, সমস্ত অপমানটা মুখ বুঁজে হজম ক
আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

পাখীকে বললাম—চলো।

পাখী চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলে—দোকানদারটা কী বলছিল

আমি সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললাম—ও কিছু না, চলো বাস
স্টপে গিয়ে দাঁড়াই।

পাখী বললে—এত খেয়েছি, বাসে চড়তে আর ইচ্ছে করছে ন
তার চেয়ে বরং একটা ট্যাক্সি নিন—

এ সব বহুদিন আগেকার কথা। তখনও সুশান্তর বেশি নাম য়নি। সবে এখানে ওখানে লেখা ছাপা হচ্ছে। দু'এক জায়গা কে লেখার তাগাদাও আসে। বাড়িতে বসে বসে সে উপন্যাসটা সবে রেছিল। নাম দিয়েছিল 'হলুদ ফুল'। পরে 'হলুদ ফুল' বইখানা নেকে পড়েছে। অনেকে প্রশংসা করেছে। বই বিক্রিও হয়েছে নেক। কিন্তু যখন সে-বই প্রথম লেখা শুরু হয়েছে তখন থেকে মি জানি। সুশান্ত কোথায় লিখতো, কখন লিখতো, কী লিখতো, া কেউ জানতে পারতো না। বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে নেক সময়ে তাকে না পেয়ে ফিরে এসেছি।

সুশান্তর মা অনেক দুঃখ করতো।

বলতো—সুশান্ত তো আজ তিন দিন বাড়ি আসেনি বাবা, আমি কবল ভেবে ভেবে মরছি—

আমি বলতাম—আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা, সে ঠিক ড়ি আসবে। সে নিশ্চয়ই কোথাও কারো বাড়িতে বসে লিখতে লখতে লেখার মধ্যে ডুবে গেছে, বাড়ির কথা আর মনে নই—

মাসিমা বলতো—তা বাড়িতে বসে লিখলে তার কী হয়? নিজের াড়ি রয়েছে, এখানেই বসে সে লিখতে পারে। যারা লেখে তারা ক সবাই পরের বাড়িতে বসে লেখে? আর যাদের বাড়িতে বসে লখে তারাই বা কী রকম লোক শুনি? আমি যে এখানে ভেবে মরছি তা তো তাদের বোঝা উচিত! আর তারাও তো একটা খবর দিয়ে যেতে পারে এখানে এসে।

মনে আছে, সেই মেয়েটাকে মধু গুপ্ত লেনে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেবার পর আর সুশান্তর সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার তখন একজামিন চলছে। সে সময়ে একদিন বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দেখা সুশান্তর সঙ্গে।

অনেক দিন পরে দেখা। দেখলাম, সুশান্তর চেহারাটা আগের

থেকে অনেক ভালো হয়েছে। লম্বা ঝুল পাঞ্জাবী পরেছে একটা পায়ে স্যাণ্ডেল।

আমাকে দেখেই একমুখ হাসলো।

বললে—কী রে, তুই কোথায় থাকিস, তোর তো পাত্তাই পাও যায় না।

আমি বললাম—কলেজের পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। এখ একজামিন চলছে—

সুশান্ত বললে—লিখছিস-টিকছিস— ?

বললাম—তোর বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন ফিরে এসেছি, তু কোথায় থাকিস আজকাল ?

সুশান্ত বললে—থাকার কি কোনও ঠিক আছে রে? যখ যেখানে থাকি সেখানটাই তখন ঘরবাড়ি করে ফেলি—

জিজ্ঞেস করলাম—মধু গুপ্ত লেনে আর গিয়েছিলি ? আমি ভেবেছিলাম একবার মধু গুপ্ত লেনে গিয়ে খোঁজ করবো।

সুশান্ত বললে—আরে দূর, সেই পাখীর কথা বলছিস তো সেখানে আর যাবার সময় পাই না, লেখার কাজ বড্ড বে গেছে—

আমি বললাম—কিন্তু সেদিন তুই আমায় খুব বিপদে ফেলেছি ভাই, আমার কাছে টাকা ছিল না, তুই আসবি বলে আর এলি ন শেষকালে আমাকে আমার এই সোনার আংটিটা জমা রেখে চ আসতে হয়েছিল।

সুশান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন, কত টাকার বি হয়েছিল ?

আমি বললাম—সাড়ে তের টাকা—আমার কাছে তো মা সাত টাকা ছিল—তোর পাঁচ টাকা, আমার দু'টাকা—

সুশান্ত বললে—ইস্, তুই একটা আস্ত বোকা, তুই কেটে পড় পারলি না ?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কেটে পড়বো? মেয়েটাকে একলা রেখে কেটে পড়বো কী করে?

সুশান্ত বললে—আমি তো ঐ জন্যেই কেটে পড়লুম—

আমি বললাম—কিন্তু ওরা কি মনে করলে বল্ তো?

সুশান্ত বললে—মনে করলে তো বয়ে গেল। কলকাতায় এমন হাজার হাজার ফ্যামিলি আছে, আবার হাজার হাজার ছেলেও আছে আমাদের মতন। ওদের সংসার চলবার কোনও অসুবিধে হবে না, ওদের পেছনে অনেক সুশান্ত আছে, তারাই ওদের সংসার চালিয়ে দেবে—

আমি বললাম—তা তোর সঙ্গে ওদের পরে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল?

সুশান্ত বললে—দূর, ওদের সঙ্গে দেখা করে আর কী হবে? আমার তো দাম উসুল হয়ে গেছে—

—কীসের দাম?

সুশান্ত বললে—ওইসব ফ্যামিলিদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখবার ইচ্ছে ছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। ওদের নিয়েই একখানা উপন্যাস লিখছি, নাম দিয়েছি 'হলুদ ফুল'। 'হলুদ ফুল' দেখেছিস?

বললাম—না।

সুশান্ত বললে—'হলুদ ফুল' যখন ফোটে, তখন সেই ক্ষেতের দিকে চাওয়া যায় না, বড় মর্মান্তিক সে দৃশ্য—

বললাম—সব ফুলই তো তাই—

সুশান্ত বললে—'হলুদ ফুল' তো টবের ফুল নয়, বন-জঙ্গলের ফুল। ক্ষেতের ফুল। টবের ফুল একটা শুকালে আর একটা ফোটে, কিন্তু ক্ষেতের ফুল একসঙ্গে সব শুকিয়ে যায়, ওরা ঝাঁক বেঁধে ফোটে, ঝাঁক বেঁধে শুকোয়। পাখীরা কলকাতা শহরে ঝাঁক বেঁধে জন্মাচ্ছে আবার একদিন ঝাঁক বেঁধেই মরবে। তাই মরবার আগে দেখে

নিলুম ভালো করে। যে ক'টা টাকা ওদের জন্যে খরচ করেছি তা হাজার গুণ উশুল করে ছেড়ে দিয়েছি—

তা সত্যি তাই-ই হলো শেষ পর্যন্ত। দু'এক বছর পরে যখন 'হলুদ ফুল' বই হয়ে বাজারে বেরোলো তখন সুশান্তর নাম হু হু করে বাজারে ছড়িয়ে পড়লো, হাজার হাজার বিক্রি হতে লাগলো। চারদিকে সুশান্তর ডাক পড়তে লাগলো সভা-সমিতিতে। লোকে বলতে লাগলো—শরৎচন্দ্রের পর এই প্রথম একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক জন্মেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তর নিন্দেও ছড়াতে লাগলো, কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরোতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে সুশান্ত একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—কী রে, কী খবর?

সুশান্ত বললে—বিয়ে করছি, যাস কিন্তু—

বলে একখানা নিমন্ত্রণের ছাপানো চিঠি দিলে, আমি চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলাম। দেখলাম কোন্ এক ৺ অমুক চন্দ্র অমুকের সপ্তম কন্যা কুমারী অমুক বালা দেবীর সঙ্গে শুভ বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কে?

সুশান্ত বললে—এ একেবারে খাঁটি স্বদেশী সয়েলের মেয়ে। লেখা-পড়া, শিক্ষা-দীক্ষা কোনও কিছুর বালাই নেই। একেবারে পুরোপুরি গেরস্থ-পোষা মেয়ে, ও-সব সিনেমা-দেখা, হোটেলে খাওয়া মেয়ে নয়, এ শাশুড়িকে ভক্তি করবে, স্বামীকে সেবা করবে, এ সেই জাতের মেয়ে। ভেবে দেখলাম এরাই সত্যিকারের বৌ হতে পারে, গৃহিণী হতে পারে; এরা প্রেম-ফ্রেম বোঝে না, মোটামুটি খেতে পরতে দিলেই এদের খুশি করা যায়—

বললাম—তুই লেখক মানুষ, এ-বউ তোর বই পড়তে পারবে ?

সুশান্ত বললে—বললুম তো সে-বালাই নেই—ওসব পড়লেই যত ঝঞ্ঝাট।

সুশান্তর যে এমন বিচিত্র মতিগতি তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি বুঝতে পারলুম না এরকম বিয়ে সে কেন করতে গেল। ওই বৌকে নিয়ে সুশান্ত কি লোক-সমাজে বেরুতে পারবে ? যে-বৌ লেখাপড়া জানে না, তার সঙ্গে বাইরের লোকদের পরিচয়ই বা করিয়ে দেবে কী করে ? আর চেহারা! চেহারাও তো তেমন ভালো নয়। সেটা তো তার বিয়ের দিনই লক্ষ্য করলাম। কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ে মানুষ। সংসার দেখে মনে হলো, সেই সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে মেয়েটা মানুষ হয়েছে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু করে কাপড় সেদ্ধ পর্যন্ত করতে হয়েছে ওই মেয়েকে। ওর চেহারা দেখে অন্ততঃ তাই-ই মনে হলো।

কিন্তু মনে হলো এ মেয়ের সঙ্গে সুশান্তর বিয়ের সম্বন্ধ কে করলে ? সুশান্ত কি নিজেই পছন্দ করেছে এই মেয়েকে ? কী জানি!

নিজের মনের প্রশ্ন নিজের মনেই রয়ে গেল। ভাবলাম সুশান্ত যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। আমার ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী ?

বৌভাতের দিন অনেক অতিথি অভ্যাগত এসেছিল। সুশান্তর লেখক বন্ধুরা, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা, সবাই সুশান্তর গুণগ্রাহী, সবাই-ই সুশান্তর কাছে উপকৃত। বিয়ের নিমন্ত্রণে এসে সবাই কৃতার্থ। সুশান্তকে কৃতার্থ করে তারা নিজেরাও যেন কৃতার্থ হয়েছে।

আমি শেষ পর্যন্ত থেকে বাড়ি চলে এসেছিলাম। তারপরে নিজের কাজে অনেক দিন আর সুশান্তর কোনও খবর রাখতে পারিনি।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সুশান্তর একটা নতুন বই বেরুচ্ছে। 'হলুদ ফুল' বেরোবার পরেই পাঠক-পাঠিকারা তার পরের বই পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, তা আমি জানতাম। সুতরাং বুঝতে পেরেছিলাম সুশান্ত বিয়ের পর তার বৌ নিয়ে যতটা না হোক, বই নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই জন্যে আমিও আর ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে চাইনি।

দু'একদিন বাড়ি ফেরার পথে সুশান্তর খবর নিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার দেখা পাইনি। অত রাত্তিরেও তাকে বাড়িতে না দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলুম।

সুশান্তর বিধবা মা আমার কাছে দুঃখ করলেন।

বললেন—তার তো ফিরতে দেরি হবে বাবা—

আমি বললাম—এখন তো সুশান্ত বিয়ে করেছে, সংসার করেছে, এখনও দেরি করে বাড়ি ফেরে ?

সুশান্তর মা বললেন—সে যে কোথায় যায়, কী করে, কী ভাবে, কিছুই বুঝতে পারি না। বৌমাও নতুন মানুষ, সাহস করে কিছু বলতে পারে না ওকে—

আমি সান্ত্বনা দিলাম।

বললাম—আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি অনেকদিন তার। সেই জন্যেই দেখা করতে এলাম। ভাবলাম রাত্তিরে তো বাড়ি আসবেই—

সুশান্তর মা বললেন—রাত্তিরে বাড়ি আসে, কিন্তু এক-একদিন তার বাড়ি ফিরতে মাঝরাতও হয়ে যায় —

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি জিজ্ঞেস করেননি সে কোথায় যায় ? অত রাত পর্যন্ত কী করে ?

সুশান্তর মা বললেন—জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা, ও বলে খুব কাজে ব্যস্ত ! তার কীসের যে কাজ, কী রাজকার্য করে তা তো বুঝতে পারি না।

আমি বললাম—আপনার বৌমাকেও বলে না? বৌমাকে দিয়ে না-হয় জিজ্ঞেস করাবেন—

সুশান্তর মা বললেন—বৌমা জিজ্ঞেস করবে?—তা'হলেই হয়েছে! বৌমা বলে ওর সামনে ভয়েই কথা বলতে পারে না—

আমি বললাম—কেন, কথা বলতে ভয় কিসের?

সুশান্তর মা বললেন—ভয় করবে না? ওর সঙ্গে কথা বলতে আমারই তো ভয় হয়! ও বাইরে তোমাদের কাছে এক রকম, আর বাড়ির ভেতরে অন্যরকম। ছোটবেলা থেকেই তো আমি ওকে ভয় করে এসেছি, এখন বড় হয়েছে, এখন তো লায়েক হয়ে গিয়েছে—

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—নিজের নানান কাজে ও ব্যস্ত থাকে, নানান ভাবনা মাথায় থাকে, তাই হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময় পায় না।

সুশান্তর মা বললেন—ভাবনা কার নেই বলো তো বাবা? ওর যখন সাত বছর বয়েস, তখন কর্তা মারা গেলেন। একলা বিধবা মানুষ তখন থেকে ওকে চোখে চোখে রেখে মানুষ করেছি, ও তো সে সব জানে না—

বললাম—ও কথা বলবেন না আপনি, সুশান্ত সব বোঝে, সব জানে, শুধু কথা বলে না, তাই। আর তাছাড়া জানেন তো, লেখক মানুষ, সব সময়েই লেখার কথা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করে—

সুশান্তর মা বললেন—লিখে কী হয়? লিখে কখনও কেউ টাকা-পয়সা উপায় করতে পেরেছে? সেসব বড়লোকদের ছেলেদেরই পোষায়। ও একটা চাকরি যোগাড় করে নিলেই পারে! যেমন আর সবাই করে। কেন, চাকরি করে কি কেউ লেখে না? চাকরি করলে একটু তবু নিয়ম-কানুন থাকে। সকাল দশটায় অফিস যাও, আর সন্ধ্যে ছ'টার সময় বাড়ি ফিরে এসো। বাড়ি ফিরে এসে মুখ হাত-পা ধুয়ে জল-টল খেয়ে বিশ্রাম করো। বাড়ির ছেলে দু'দণ্ড বাড়িতে থাকো। মা'র সঙ্গে দুটো কথা বলো, বৌয়ের সঙ্গে দুটো কথা বলো, সংসার

কেমন করে চলছে সেদিকে চেয়ে দেখো, তবে তো দশজনে ভালো বলবে! চিরকাল তো শ্বশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতে তাই-ই দেখে এসেছি। তা নয়, দিনরাত বাড়ির বাইরে থাকা, এ কি ভালো লাগে?

এক নাগাড়ে সেদিন সুশান্তর মা অনেক দুঃখ করেছিলেন। আমিও যথারীতি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে সুশান্তর বিরুদ্ধে কখনও উত্তেজিত হইনি। আমি জানতাম যারা লেখক হতে এ সংসারে জন্মেছে কিংবা যারা এ সংসারে জন্মে লেখক হয়েছে, তারা কখনও এ সংসারে বাঁধা পথে চলেনি।

কিন্তু অবাক হয়েছিলাম অন্য জিনিস ভেবে। সুশান্ত তো অনেক বিচক্ষণ ছেলে। সে তো অনেক ভেবেচিন্তেই এই বৌ ঘরে এনেছে। তাকে তো ভুল বোঝার অবকাশ নেই সুশান্তর। তবে কেন এমন করছে সে!

কিন্তু সুশান্তকে নিয়ে অত ভাববার সময়ও তখন আমার ছিল না। লেখাপড়ার পর্ব শেষ করে তখন আমি চাকরি-জীবনের জোয়াল কাঁধে নিয়েছি। আমারও ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব বেড়েছে। সুশান্তর ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মত অবসর স্বভাবতই আমার কমে গেছে তখন।

কিন্তু তারই মধ্যে ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়ে গেল সুশান্তর সঙ্গে।

বলতে গেলে আমি নিজে থেকেই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম।

খবরের কাগজে এক কোণে একটা ছোট খবরে জানতে পারলাম যে, খিদিরপুরে একটা সভায় সুশান্ত পরের দিন সভাপতিত্ব করবে।

পরের দিন ঠিকানা খুঁজে সভায় গিয়ে হাজির হলাম ঠিক সময়ে। দেখলাম সুশান্তর অনেক ভক্তমণ্ডলী তার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সেখানে ভীড় করেছে।

আমাকে সুশান্ত দেখতে পায়নি। আসলে আমিই সুশান্তর সঙ্গে

দেখা করিনি। দূর থেকে শুধু তার বক্তৃতা শুনলাম। বড় বড় অনেক বাণী সে দিলে। অনেক চিন্তা অনেক জ্ঞান, অনেক অমূল্য অনুভূতির কথা সে সবিস্তারে বলে গেল। তার ভক্তমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তার বাণী শুনতে লাগলো, তার জীবনের অভিজ্ঞতা শুনতে লাগলো। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল।

আমিও তার বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম সুশান্ত অনেক শিখেছে, অনেক দেখেছে, অনেক ভুগেছে। অনেক দেখা-শোনা আর সহ্য করার ফলেই সুশান্তর মনে সেই জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভ হয়েছে।

যখন সভা শেষ হলো তখন আমার দেখা করার পালা।

অনেক ভক্তের ভীড় ঠেলে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুশান্ত আমাকে দেখেই বললে—তুই ?

বললাম—তোর বক্তৃতা শুনতে এসেছি—তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

সুশান্ত বললে—মোটেই সময় পাচ্ছি না ভাই—আর একখানা বড় বইতে হাত দিয়েছি—

তারপর একটু থেমে বললে—এই দেখ না, এইসব ছেলেমেয়েরা কিছুতেই ছাড়ে না, কেবল আমাকে দিয়ে মিটিং করায়—

আড়ালে নিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কী রে, তোর খবর কী ? তোর বাড়িতে অনেকবার গিয়েছিলাম, দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছি। তুই কোথায় থাকিস ?

সুশান্ত বললে—বড্ড ব্যস্ত আছি ভাই, মোটে সময় পাই না—

আমি বললাম—কীসে এত ব্যস্ত ?

সুশান্ত বললে—কাজের কি শেষ আছে রে, তিনখানা বই বেরিয়েছে, আরো তিনখানার এ্যাডভান্স নিয়েছি। তার ওপর এই মিটিং আর সংবর্ধনা নাগাড়ে চলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লিখিস কখন তুই ? কোথায় বসে

লিখিস ? বাড়িতে তোর পাত্তাই পাওয়া যায় না—

সুশান্ত বললে—সেই কথাই তো বলছি, লেখবার মোটে সময় পাচ্ছি না। যখন যেখানে পারি বসে লিখে দিই। কখনো পাবলিশারদের দোকানে বসে, কখনো বা কারো বাড়িতে, এমনি করেই চলছে—

আমি বললাম—কিন্তু ওরকম করে লিখলে তো তোর লেখা খারাপ হয়ে যাবে !

সুশান্ত বললে—খারাপ হয়ে যাবেই তো ! এখন নামই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত নাম না হলে বোধহয় আরো ভালো লিখতে পারতুম ভাই —প্রথম বইটা নিরিবিলিতে বসে লিখেছিলাম বলে অত ভালো হয়েছিল।

বললাম—তা এখনো নিরিবিলিতে লিখলেই পারিস ! এখন বিয়ে করেছিস, নিজের বাড়ি রয়েছে, বাড়ির একটা ঘরে খিল দিয়ে বসে লিখলে কে আপত্তি করছে ?

সুশান্ত বললে—সে আর হয় না রে, আর হয় না, ওই যে তোকে বললুম, নামই লেখকের সবচেয়ে বড় শত্রু। এখন একটা মাত্র উপায় আছে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোনও অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে বাস করা—

বললাম—তা যাস না কেন ?

সুশান্ত বললে—চলে গেলে জীবন দেখবো কী করে ? জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তো সাহিত্য করা যায় না। এই ভীড়ের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, আবার ভীড়ের মধ্যে থেকেও ভীড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

বললাম—তুই তো সব জানিস, তোকে আর কী শেখাবো—

সুশান্ত বললে—আমি নিজের কলেই নিজে ধরা পড়েছি। আমার গুণটাই আজকে আমার দোষ হয়ে গেল ভাই।

কথার মধ্যিখানেই একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এসে হাজির হলো।

বললে—চলুন সুশান্তদা, চলুন—অনেক দেরি হয়ে গেল—

বলে মেয়েটা সুশান্তর একটা হাত ধরে টানতে লাগলো।

আবার বললে—আমি তখনই বলেছিলুম এখানে এলে রাত আটটা বেজে যাবে। ওদিকে সমস্ত লোক আপনার জন্যে ওয়েট করছে। আটটায় টাইম দিয়েছিলুম, যেতে যেতে প্রায় ন'টা বেজে যাবে।

আমি হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। মেয়েটা ঝলমলে শাড়ি পরেছে। চুলবুলে কথাবার্তা। কথা বলতে বলতে দশ বার সামনের শাড়িটা খসে পড়ে যায়। যেন সুশান্তর সঙ্গে তাদের অনেক দিনের জানাশোনা। যেন আমার চেয়ে সুশান্তর ওপরে তাদেরই বেশি অধিকার।

মেয়েটা বললে—জানেন সুশান্তদা, আমি নিজের হাতে আপনার জন্যে কাটলেট রান্না করেছি—

ছেলেটা বললে—বুলি কী বলছিল জানেন সুশান্তদা, আপনি তো শুধু হুইস্কির ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, বুলি বলছিল 'জীন'টা রাখা উচিত—

সুশান্ত বললে—তা রাখো, যারা 'জিন' খেতে চায় তারা 'জিন'ই খাবে!

বুলি বললে—আমি ঠিক বলিনি সুশান্তদা? আমি দেখেছি ককটেল পার্টিতে অনেকে 'হুইস্কি' খেতে চায় না—

ছেলেটা বললে—'জিন' যে কেন লোকে খায় আমি বুঝতে পারি না।

—তুমি থামো তো!

মেয়েটা চুলবুল করে উঠলো। বললে—দেখেছেন সুশান্তদা, এ কদিন সবে খেতে শিখলো এর মধ্যে ককটেল-এক্সপার্ট হয়ে গেছে! ওর কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তুমি ক'টা ককটেল পার্টিতে গিয়েছো শুনি? আমি তোমার থেকে বেশি জানি। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে ককটেল পার্টির রেওয়াজ আছে।

আমি অবাক হয়ে এদের আজব কথাবার্তা শুনছিলাম। আর অবাক হয়ে ভাবছিলাম—এরা কারা ? সুশান্তর সঙ্গে এদের সম্পর্কটাই বা কী ? সুশান্তর সঙ্গে এদের পরিচয় হলোই বা কী করে ? এরাও কী সুশান্তর পাঠক-পাঠিকা ? এইসব ককটেল পার্টিতে যাওয়া ছেলেমেয়েরাও কী বাংলা উপন্যাস পড়ে ?

কে জানে !

আমি দাঁড়িয়ে আছি সে-কথা বোধহয় সুশান্ত ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ আমাকে দেখেই যেন মনে পড়ে গেল তার !

আমার দিকে ফিরে বললে—আচ্ছা আসি রে—

বললাম—আবার কবে দেখা হচ্ছে তোর সঙ্গে ?

সুশান্ত যেতে যেতে বললে—দেখছিস তো ব্যাপার, এর পর কখন দেখা হবে কথা দিতে পারছি না। যদি সম্ভব হয় তো যাবো তোর বাড়িতে একদিন—

সেদিন ওই পর্যন্তই।

মানুষের জীবনের এত রকম-ফের দেখেছি যে আর কিছুতেই আজকাল অবাক হই না। অবাক হওয়া এখন প্রায় থেমে আসছে আর বয়েসও তো হচ্ছে বটে।

কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে যা দেখতুম সমস্তই আমাকে অবাক করতো। সুশান্তর খ্যাতি আমার চোখের সামনেই হলো, আবার আমার চোখের সামনেই···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সুশান্তর খ্যাতি তখন অভ্রভেদী। যেখানেই যাই সেখানেই সুশান্তকে নিয়ে আলোচনা। সুশান্তর বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে তর্ক। সাহিত্য কী এবং কী নয়, সে-সম্বন্ধে সুশান্ত সান্যাল কী বলেন তা নিয়ে হৈ-হৈ বেধে গেছে অনেকদিন অনেক বৈঠকখানায়।

একদল বলতো—সুশান্তবাবু সাহিত্যিক নয়—ও সব হচ্ছে সিজন্ ফ্লাওয়ার—

আর একদল বলতো—আমরাও বলে দিচ্ছি সুশান্ত বাবুর "হলুদ্ ফুল" এ-যুগের এপিক্—

এ-সব কথা আমার কানে আসতো। আমি কিছু উচ্চবাচ্য করতাম না। তার কারণ সুশান্ত আমার বন্ধু। বন্ধুর লেখা সম্বন্ধে কিছু বলা আমার শোভা পেতো না। সবাই জানতো আমি যে-মতই পোষণ করি না কেন, সেটা হবে পক্ষপাতদুষ্ট।

কিন্তু আমার অবাক লাগতো সুশান্তর চাল-চলন দেখে।

প্রথমতঃ এত সময় পায় কোত্থেকে সে? এত মিটিং, এত ভক্ত, এত সংবর্ধনা সত্ত্বেও সে লিখছে কেমন করে?

সুশান্ত বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি অবশ্য তার কথায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সে যদি একবার আমাদের বাড়ি আসতো ভালো হতো। আমার একটু ভালো লাগতো।

তা হোক, মনে মনে ভাবতাম সে আরো বড় হোক, তার আরো অনেক নাম হোক, তার খ্যাতি আমারই আনন্দ, তার উন্নতিতে আমারই উন্নতি। তা ছাড়া আমার নিজেরও তখন অনেক সমস্যা ছিল। সেই সব সমস্যার ভিড় ঠেলে তার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটলো।

বাড়িতে এসে শুনলাম সুশান্তর মা নাকি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে।

তবু যেমন ভাবে ছিলাম, সেইভাবেই সুশান্তদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ির সদর-দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিলেন একজন মহিলা।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—আমি সুশান্তর বন্ধু, সুশান্তর মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেইজন্যে এসেছি—

এতক্ষণে যেন একটু আভাসে চিনতে পারলাম।

বললাম—আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না···

মহিলাটি বললে—আমি তাঁরই স্ত্রী—

—ও, নমস্কার।

আমি সসম্ভ্রমে তাকে নমস্কার করলাম।

সুশান্তর স্ত্রীও হাত দু'টো একটু উঠিয়ে বললে—

—নমস্কার—

বললাম—কী হয়েছে, বলুন তো ?

সুশান্তর স্ত্রী বললে—আপনি বসুন, আমি মা'কে ডেকে দিচ্ছি—

বলে আমাকে বাইরের ঘরে বসতে বলে নিজে ভেতর দিকে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এ-চেহারা তো সে-চেহারা নয়। সেই বিয়ের সময় যাকে দেখেছিলাম। তখন সত্যিই বড় কুৎসিত মনে হয়েছিল সুশান্তর বউকে। বড় কালো মনে হয়েছিল। বিয়ের দিন বিয়ের কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে খুব সুন্দর করে পরিবেশন করা হয়। তা সত্ত্বেও সেদিন নতুন-বৌয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের এতটুকু আভাস পাইনি। কিন্তু এখন তো অন্যরকম দেখাচ্ছে। এখন যেন সুন্দর দেখাচ্ছে সুশান্তর বউকে।

খানিক পরেই সুশান্তর মা এসে হাজির হলেন।

আসতেই আমি প্রণাম করলাম।

বললাম—কেমন আছেন মাসিমা ?

সুশান্তর মা বললেন—তোমাকে অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম বাবা। ডাকবো-ডাকবো করেও ডাকা হয়নি। শেষে আর না-ডেকে পারলুম না। তোমাকে একটু কষ্ট দিলুম বাবা—

বললাম—না না, কষ্ট কীসের ? বলুন না, আমার দ্বারা যদি

আপনার কিছু উপকার হয়—

সুশান্তর মা বললেন—তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি, আমার জানাশোনা আর কেউ তো নেই। তাই তোমাকে ডাকা—

বললাম—আপনি অকপটে আমাকে সব বলতে পারেন, আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি সব কিছু করবো। আপনি বলতে কোনও দ্বিধা করবেন না মাসিমা—

সুশান্তর মা বললেন —তবে শোনো বাবা, সুশান্ত আজ এক মাস ধরে বাড়ি আসছে না—

বললাম—সে কী ?

—হ্যাঁ বাবা, দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলি। সে যে কোথায় আছে, কী করছে, তাও জানি না।

জিজ্ঞেস করলাম—তা'হলে আপনাদের চলছে কী করে ?

সুশান্তর মা বললেন—ভগবান চালিয়ে দিচ্ছেন। ওই বাড়ি-ভাড়াটুকু আছে, তাই দিয়েই কোনও রকমে কষ্টেসৃষ্টে চলছে—

বললাম--কিন্তু সে আসছে না কেন ?

—কে জানে বাবা, কেন আসছে না! ছেলের বিয়ে দিলুম তো ওই জন্যেই। ভাবলুম, বিয়ে দিলে হয়তো ছেলেব বাড়িমুখো টান হবে। কিন্তু এ দেখছি উল্টো হলো—। বিয়ের আগে বরং একটু-আধটু বাড়িতে থাকতো, এখন একেবারে বাড়ি-ছাড়া হয়ে গেল।

—সুশান্ত তো নিজে মেয়ে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল ?

সুশান্তর মা বললেন—আমি তো ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিইনি বাবা। ও নিজেই তো ওই মেয়েকে পছন্দ করেছে—

—আপনার বৌমা ? আপনার বৌমা কী বলে ?

সুশান্তর মা বললেন—বৌমার কথা থাক বাবা। সে-সব কথা না-বলাই ভালো—

বুঝলাম, সংসারে কিছু গোলমাল আছে।

আমি আর সে-প্রসঙ্গ না তুলে অন্য কথা বললাম।

বললাম—সুশান্তর পাব্লিশারদের কাছে নিশ্চয়ই তার ঠিকান আছে, সেখানে খোঁজ করেছেন ?

সুশান্তর মা বললেন—আমি তাদের কাউকেই চিনি না বাবা সে কী ছাই-ভস্ম লেখে, তাও জানি না। আমি তো লেখাপড়া জানি না। শুনেছি শুধু সে কী সব বই লেখে—

বললাম—আচ্ছা, আমি তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানিয়ে যাবো—

সুশান্তর মা বললেন—তা'হলে আমার খুব উপকার হয় বাব আমি তা'হলে বেঁচে যাই—

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম।

বললাম—আমি কালকেই তাদের কাছে যাবো, সেখান থেকে ঠিকানা জেনে এসে আপনাকে জানাবো—

সুশান্তর মা বললেন—আমাকে ঠিকানা জানালে কী সুবিধে হবে বাবা, তার চেয়ে তুমিই বরং সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করো। দেখ করে আমার কাছে তাকে ডেকে নিয়ে এসো—

বললাম—সেই কথাই রইলো—

সুশান্তর মা বললেন—তাকে বোলো, বৌমা না-হয় দোষ করেছে কিন্তু আমি কী দোষ করলাম ? আমি তো ছোটবেলা থেকে ওকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন এ-বাড়িতে থাকলে কী দোষ—

মায়ের প্রাণ ! মা'র দুঃখ বুঝতে পারার মত বুদ্ধি সুশান্তর আছে তাকে সে-কথা বোঝানো বাহুল্য।

কিন্তু সুশান্তর বউ-ই বা কী দোষ করেছে ?

আমি সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসছিলাম।

সুশান্তর মা আমার সঙ্গে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—আর একটা কথা শোনো বাবা, বলি—

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বললাম—বলুন—

সুশান্তর মা গলা নিচু করলেন।

বললেন—ভেতরে বৌমা আছে আবার শুনতে পাবে, তাই তখন বলিনি। তুমি বাবা ঘরের ছেলের মত। তোমাকে আর বলতে কী! কাউকে যেন বোলো না বাবা, সুশান্ত এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে—

—সে কী?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

সুশান্তর মা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—চুপ চুপ, আর জোরে কথা বোলো না বাবা, বৌমা আমার শুনতে পাবে। শুনলে আবার অনর্থ বাধাবে—

—আপনার বৌমা জানে না?

সুশান্তর মা বললেন—না বাবা, কেউই জানে না। কিন্তু আর বেশিদিন চাপা রাখাও যাবে না খবরটা। বাড়িওয়ালার লোক এসে আমায় বলে গেছে—

আমি খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এ কী করলে সুশান্ত? এমন কেন করতে গেল? এ কি টাকার অভাব, না ইচ্ছে করে কারো ওপর প্রতিশোধ নেওয়া?

সত্যিই যদি টাকার অভাব হয় তো কেন তা হলো? তার বই তো হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়। টাকার অভাব কেন হতে যাবে? এত টাকার তার কিসের দরকার? আর প্রতিশোধ? প্রতিশোধই যদি নেবে তো কার ওপর প্রতিশোধ?

কী জানি, আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে বাইরের অন্ধকারে পা বাড়ালাম—

এমন করে যে আজ সুশান্তর কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে তা ভাবিনি। অথচ যারা সেদিন সাহিত্যিক হিসেবে সুশান্তকে এ-

যুগের শ্রেষ্ঠ এপিক-রাইটার বলে বড়-বড় ভারী-ভারী প্রবন্ধ লিখেছিল তারা তো এখনও কলেজে পড়ায়, তারা তো এখনও সাহিত্য-সভা গিয়ে সভাপতিত্ব করে! তারা আজ সুশান্তর কথা একবারও বলে না কেন? সুশান্তর নাম উল্লেখও করে না কেন?

সে কি লজ্জায়?

কে জানে!

মনে আছে, আমি পরের দিনই সুশান্তর এক পাব্লিশারে দোকানে গিয়েছিলাম।

পাব্লিশার ভদ্রলোকের কী যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

আমি আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি বললেন—দেখুন, তাঁর নিষেধ আছে। তিনি আমাদে নিষেধ করে গেছেন, কাউকে ঠিকানা দিতে। আমাকে মাফ করবেন

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোকের এবার বোধহয় দয়া হলো।

বললেন—দেখুন, উনি মীটিং-এ যান না আর—সবাই মীটিং- নিয়ে যায় বলে সুশান্তবাবু কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছেন—

বললাম—বিশ্বাস করুন, ওঁকে মীটিং-এ নিয়ে যাবার জন্যে আ আসিনি—

—তাহলে?

বললাম—আমি সুশান্তর বাল্যবন্ধু। আমার নিজের বিশে দরকারে ওর ঠিকানা চাইছি—

ভদ্রলোক বললেন—মাফ করবেন, ঠিকানা আমরা দিতে পারবে না, লোকে ওইসব বলে বড় বিরক্ত করে। ওঁর সত্যিই লেখার ক্ষ হয়। এইসব মীটিং-এর চাপে আগের চেয়ে ওঁর লেখা অনেক ক গেছে—তাতে ওঁরও ক্ষতি হয়, আমাদেরও ক্ষতি—

এর পর আর কোনও কথা বলা চলে না। হতাশ হয়ে চ

আসতে হলো। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলাম এই ভেবে যে, আমার ছোটবেলার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ঠিকানা দিলে না ওর পাব্লিশার।

সেদিন একটা কাজে শ্যামবাজারে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে মনে হলো মধু গুপ্ত লেনে গিয়ে সুশান্তর খবরটা নিলে হয়। তারা হয়তো সুশান্তর ঠিকানা দিলেও দিতে পারে!

বাস থেকে মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে পড়লাম।

আমার চেনা রাস্তা। বহুদিন আগে একদিন সুশান্তর সঙ্গেই পাখীদের বাড়িতে এসেছিলাম।

মনে মনে সুশান্তর কথাটা ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম। সুশান্তটা এমন করলে কেন? কীসের জন্যে পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করে দিলে? কেন সে বিয়ে করেও নিজের বাড়িতে থাকে না?

অনেক কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল। ভাবলাম সেই পাখীই কি এত বছর পরে আমাকে চিনতে পারবে? তার পরে তো কত বছর গড়িয়ে গেছে। কত নাম হয়েছে সুশান্তর। কত ভালো ভালো বই বেরিয়েছে এই ক'বছরের মধ্যে!

সেই যেদিন পাখীকে ট্যাক্সিতে করে তাদের মধু গুপ্ত লেনের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম, তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

তার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পাখী বলেছিল—ভেতরে আসুন না একবার—

আমি বলেছিলাম—রাত হয়ে গেছে। এখন আর নামবো না—

—কী আর এমন রাত হয়েছে, সুশান্তদা তো রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত এখানে থাকে—

আমি বললাম—আমি তো সুশান্ত নই—

—তা সুশান্তদা না-ই বা হলেন, আরো অনেকেই তো এখানে আসেন, আপনিও না-হয় এলেন—

বললাম—আমার বাড়ি ফিরতে রাত হলে বকুনি খেতে হয়—

—সে কী, এখনও আপনি ছেলেমানুষ আছেন নাকি ?

বললাম—রাত্তিরে সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা কি ছেলেমানুষের লক্ষণ ?

হঠাৎ পাখীর মা শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে।

বললে—কী রে, পাখী এলি ?

পাখী মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই দেখ মা, বাড়ির ভেতরে আসছেন না মোটে, এত করে বলছি—

মাসিমা রাস্তায় নেমে এল।

বললে—ওমা, সে কী, না না, বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে ফিরে যেতে নেই, এসো, এসো। কই, সুশান্ত কোথায় ?

পাখী বললে—সুশান্তদা চলে গেছে—

—সে কী রে, আজ যে চলে গেল হঠাৎ ? কোনও কাজ ছিল নাকি ?

আমি বললাম—সুশান্ত পাখীর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে একটা কাজে চলে গেছে—

মাসিমা বললে—তা ভালোই হয়েছে, তুমি এসো বাবা, তোমার লজ্জা কী ? এসো—এসো—

শেষ পর্যন্ত বার বার পীড়াপীড়িতে আমাকে নামতেই হলো। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি আবার পাখীদের বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

সেই বসবার ঘরখানাতে গিয়েই আবার বসতে হলো।

মাসিমা বললে—তুমি পা তুলে বোস বাবা, আরাম করে বোস অত পর পর মনে করছো কেন আমাদের ? সুশান্ত আমার ছেলের মত, তুমিও তাই—

মাসিমা পাখীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই খেয়ে এসেছিস নাকি ?

—হ্যাঁ মা, খেয়ে এসেছি। তোমায় ভাবতে হবে না।

মাসিমা আমার দিকে চেয়ে বললে—তবে আর কি, তবে আর অত তাড়াতাড়ি করছো কেন ?

তারপর একটু থেমে বললে—তোমরা তা'হলে গল্প করো বাবা, আমি রান্নাঘরের পাট চুকোতে যাই—

বলে মাসিমা ভেতরে চলে গেল।

পাখী বললে—কী হলো, পা তুলে আরাম করে বসুন! মা যে আপনাকে পা তুলে আরাম করে বসতে বলে গেল—

বললাম—পায়ে ময়লা আছে, বিছানা ময়লা হয়ে যাবে, আপনারা আবার এই বিছানায় শোবেন তো—

—আপনি আবার আমাকে 'আপনি-আপনি' করছেন কেন বলুন তো ? আমি আপনার থেকে ছোট, তা জানেন না ?

বললাম—আজই তো প্রথম পরিচয় হলো, তাই···

—তা প্রথম হলেই বা, সুশান্তদা'র সঙ্গেই বা আমাদের ক'দিনের আলাপ ?

জিজ্ঞেস করলাম—কত দিনের ?

—এই তো গেল মাসে!

—মাত্র একমাস ?

পাখী বললে—হ্যাঁ। সুশান্তদাও ঠিক আপনার মত এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছিল—তার পর থেকে কত আপনার হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে যে একবার আসে সে রোজ আসে। আমার মা সকলকে আপন করে নেয়—

তারপর বললে—আপনি আবার কবে আসবেন বলুন ?

আমি বললাম—সে একদিন আসা যাবে'খন—

—না, বলুন, কবে আসবেন!

বললাম—বলছি তো আমার সুবিধে মত একদিন আসলেই হবে।

—না, কালকে আসুন।

বললাম—এখন আমি কথা দিতে পারবো না—

পাখী এবার আমার কাছে ঘেঁষে এল। একেবারে মুখের বড় কাছাকাছি।

বললে—না, বলুন, কালকে আসবেন ?

আমি মুখটা পেছিয়ে নিলাম।

—বলুন, আসবেন কাল ?

বললাম—অত কাছে এসো না, তোমার মা এসে পড়বে—

পাখী বললে—মা এখন আসবে না। আপনি বলুন, কাল আসবেন ? কথা দিন, কথা না দিলে আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না—দিন কথা—

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম। এমন যে হবে আমি ভাবতেই পারিনি। এ-রকম সংসার কলকাতা শহরে আছে তা আমি সুশান্তর কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু সে যে এই রকম তা জানা ছিল না। বহু দিন পরে "হলুদ ফুল' উপন্যাসটা পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, হয়তো এদের নিয়েই সুশান্ত বইখানা লিখেছে। এদের ভালো করে না জানলে "হলুদ ফুলে"র মত উপন্যাস কখনও কল্পনা করে লেখা যায় না।

মনে আছে, সেদিন যে কী বিপদেই পড়েছিলাম তা শুধু আমিই জানি আর জানে আমার অন্তরাত্মা। আমার মনে হচ্ছিল আমি কোথাও পালিয়ে যাই, আমি এক দৌড়ে এখান থেকে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাই।

কিন্তু পাখী বোধহয় অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

বললে—সত্যি, আপনার মত একগুঁয়ে মানুষ আমি দেখিনি—বাবা, বাবা, কী যে লোক আপনি। আমার কথাটা একটু রাখলেন না।

বললাম—আমি এলে তোমাদের কী সুবিধে হবে ?

পাখী বললে—ওমা, সুবিধের কথা ভেবে আমি বলছি নাকি ? আপনার সঙ্গে নতুন পরিচয় হলো, তাই বলছি—

বললাম—আমি তো বলছি আসতে চেষ্টা করবো—

হঠাৎ পাখী বললে—কেন, আমার ওপর রাগ করেছেন বুঝি ?

—কেন, তোমার ওপর রাগ করতে যাবো কেন ? তুমি কী করেছো ?

—আমাকে কি সত্যিই দেখতে খারাপ ?

হঠাৎ পাখীর এই কথাতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ-পাড়ায় আমার কেউ জানাশোনা নেই। এখানে এই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে পাখী যদি চিৎকার করে ওঠে, যদি বলে আমি পাখীর ওপর অত্যাচার করেছি, যদি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয় ?

চায়ের দোকানে আমি সোনার আংটিটা জমা দিয়ে এসেছি, তার ব্যথাটা তখনও শুকোয়নি ভালো করে।

হঠাৎ বললাম—আমি উঠি—

ভেতর থেকে হঠাৎ মাসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মাসিমা বলছে—ও রে পাখী, ছেলেকে যেন ছাড়িসনি, আমি আসছি—

পাখী বললে—ওই দেখুন, এখন মা না-আসা পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন না—

তারপর হঠাৎ পাখী একটা কাণ্ড করে বসলো।

বললে—এত ভয় পাচ্ছেন কীসের জন্য শুনি ? বাড়িতে কে আছে ? বাড়িতে গিয়ে তো সেই একলা বিছানায় শুতে হবে—

বললাম—ও সব কথা আমাকে বোলো না !

পাখী এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ একেবারে আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সত্যিই, ভয় পাওয়ার মতই অবস্থা তখন আমার। আমি তাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বললাম—ওঠো, ওঠো, তোমার মা কী ভাববেন বলো দিকিনি ?

ছি, ছি, ওঠো—পাখী তেমনি আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

বললাম—ওঠো—ওঠো—থামো—

পাখী তেমনি মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতেই বললে—না, আমি কিছুতেই উঠবো না, কেন, আমি কী দোষ করেছি যে আমার দিকে আপনি একবার ফিরেও তাকাবেন না—

বললাম—তুমি ওঠো, কী বলতে চাও, বলো—উঠে বলো—

জোর করে ধরে তুলে দিলাম পাখীকে। তুলে ধমক দিয়ে বললাম—থামো, তোমার কান্না থামাও, কী বলতে চাও বলো—তুমি কি আমাকে সুশান্তদা পেয়েছো ?

পাখীর কান্না এক নিমেষে থেমে গেল।

বললে—তা তো বলবেনই, আপনারা বড়লোক, অমন কথা তো বলবেনই !—

বলে একটু থামলো।

তারপর আবার বলতে লাগলো—আমরা গরীব বলেই আজ আমাদের এই অপমানটা করতে পারলেন। আজ যদি আমাদের রেশন কেনবার টাকা থাকতো, আজ যদি আমাদের বাড়ি-গাড়ি করবার টাকা থাকতো তো আপনাদের আমরা দেখিয়ে দিতুম—তা জানেন ? আজ পেট ভরে খেতে পাই না বলেই আপনাদের এই খোসামোদ! আপনাদের ভাবনা কী ? আপনাদের বাবা-মা-ভাই-বোন-বউ সব আছে, আপনাদের পকেটে পয়সা আছে, আপনারা কী করে বুঝবেন কাকে বলে ক্ষিধে, কাকে বলে চরিত্র, কাকে বলে লজ্জা ? আমরা কি মানুষ ?—আমরা তো আপনাদের খেলার পুতুল !

বলতে বলতে আবার ভেঙে পড়লো পাখী।

তারপর এক মুহূর্ত নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো —নিজের মা যার মেয়েকে পরপুরুষের হাতে তুলে দেয়, তার দুঃখটা আপনারা কেমন করে বুঝবেন ? আপনাদের কাছে আমি কোন্

লজ্জায় নির্লজ্জ হয়েছি তা তো আপনাদের জানবার দরকার নেই! আপনারা নিজেরা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। আমাদের কথা ভেবে আপনাদের কী লাভ? নিজেরা সুখে ঘর-সংসার করতে পারলেই তো আপনারা নিশ্চিন্ত! যান, এখন বাড়ি যান।

আমি তো অবাক। পাখীকে সন্ধ্যেবেলা থেকে দেখে আসছি। কিন্তু এ যেন অন্য মূর্তি, অন্য মানুষ।

বললাম—তুমি আমায় ভুল বুঝো না পাখী, ভুল বুঝো না--

পাখী আর একটু দূরে সরে গেল এবার।

বললে—আর কথা নয়, এবার বাড়ি চলে যান, আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে—বাড়ি যান—

তবু বললাম—শোনো—রাগ করো না—

—যান বলছি, চলে যান এখনি—

ভেতর থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ শোনা গেল—ওরে, কাকে কী বলছিস? ছেলেকে একটু বসতে বল, আমি যাচ্ছি—

কিন্তু পাখীর তখন অন্য চেহারা।

বললে—এখনও বসে আছেন? যান—

আমি আস্তে আস্তে উঠলাম। তারপর নিঃশব্দে পায়ে জুতো-জোড়াটি গলিয়ে দিয়ে বাইরে অন্ধকার রাস্তায় এসে নামলাম।

এ-সব কথা সুশান্তকে আমি সেদিন কিছুই বলিনি। পরের দিন শ্যামবাজারে মোড়ের হোটেলটাতে গিয়ে সাড়ে তের টাকা দিয়ে আমার সোনার আংটিটা অতি সহজেই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু যতই দিন কেটে যাচ্ছিল ততই সেদিনকার সেই কথাটা মনে পড়ে কৌতুক অনুভব করছিলাম। ভেবেছিলাম, যদি কখনও উপন্যাস লিখি তো ওই পাখীদের নিয়ে উপন্যাস লিখবো।

তবে আমি না লিখলেও, লিখেছিল সুশান্ত। ওই "হলুদ ফুল"

লিখেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল বাংলা-সাহিত্যে।

সেদিন মধু গুপ্ত লেন দিয়ে পাখীদের বাড়ি যাবার সময় অনেকদিন পরে আবার সেই সব কথাগুলো মনে পড়ছিল।

কিন্তু যখন সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌঁছলাম তখন অবাক হয়ে গেলাম দেখে। বাড়িটার সে-চেহারা তো আর নেই—সেই আগেকার চেহারা!

হঠাৎ কানে এল বাড়ির ভেতরে যেন ভীষণ একটা গোলমাল হচ্ছে—

বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারলাম।

উঁকি মেরে চমকে উঠেছি। সুশান্তর স্ত্রী না?

তারপর আস্তে আস্তে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। গোলমালের মধ্যে আমার অস্তিত্ব আর কেউ টেরই পেল না।

দেখলাম পাখীর সঙ্গে ঝগড়া করছে সুশান্তর বউ।

আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল।

বললে—আপনি কে?

এতক্ষণে আমার দিকে পাখী চেয়ে দেখলে। সুশান্তর বউ আমার দিকে ফিরেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

বললে—আপনি? আপনি এসেছেন?

আমি বললাম—আপনি এসেছেন কেন? আমি তো সুশান্তর মা'কে কথা দিয়েছিলুম যে, তার ঠিকানা যোগাড় করে জানাবো—

—কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করবার পরও আপনি এলেন না, তাই খুঁজে খুঁজে এখানে এলুম—শুনলুম আমার শ্বশুরের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এদের এই বাড়িটা কিনে দিয়েছে—

ভদ্রলোক বললেন—খবরদার বলছি, মিথ্যে কথা বলবেন না—এ-বাড়ি আমি আমার টাকায় কিনেছি—

পাখীর মাথার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পাখী বললে—আপনার স্বামীর টাকায় এ-বাড়ি

কিনেছি সে-কথা কে বললে আপনাকে—

সুশান্তর স্ত্রী বললে—আমার স্বামীই বলেছে—

ভদ্রলোক বললে—তাহলে ডেকে নিয়ে আসুন তাঁকে, তিনি নিজের মুখেই সে-কথা বলে যান, দেখি তাঁর কত সাহস—

—আমার স্বামী মিথ্যে কথা বলবে না।

—কিন্তু তিনি নিজে এসে সে-কথা বলেন না কেন!

আমি কথার মাঝখানে বললাম—কী হয়েছে ব্যাপারটা বলুন তো?

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি কেন আবার এর মধ্যে এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন—ইনি আবার কে পাখী? তুমি এঁকে চেনো?

আমি বললাম—আমি সুশান্তর বন্ধু, তার খোঁজ করতেই আমি এসেছি—কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো দেখিনি—

এতক্ষণে মাসিমা হঠাৎ এসে হাজির হলো বাইরের দিক থেকে।

বললে—ওমা, এখানে কী হচ্ছে গো তোমাদের?

ভদ্রলোক বললে—এই দেখুন মা, এই মহিলাটি বলছেন এ বাড়ি ওঁর স্বামীর টাকায় কেনা।

—ওমা, কোথায় যাবো! আমার জামাই বলে নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে এই বাড়ি চল্লিশ হাজার টাকায় কিনে সারিয়ে নিয়েছে। আর তুমি বাছা কিনা বলছো সুশান্তর টাকায়? সুশান্ত এত টাকা কোথায় পাবে?

আমি বললাম—কিন্তু সুশান্ত যে তার নিজের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে—

মাসিমা বললে—সে বাবা বড় উড়োনচণ্ডী ছেলে, দু' হাতে টাকা খরচ করতো, হয়তো নেশা-ভাঙ করে উড়িয়ে দিয়েছে—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মাসিমা আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—এই আমার জামাই বাবা, মস্তবড়

কারবার করে। এই জামাই-ই কিনে নিলে বাড়িটা তাই তবু মাথা গুঁজে আমরা আছি। নইলে কোথায় থাকতুম বলো তো বাবা। তোমরা তো কেউ বাবা দেখলে না আমাদের—

জামাই ভদ্রলোক বললে—আপনারা মিছিমিছি এখানে সময় নষ্ট করতে এসেছেন, সে এখানে নেই—

আমি চারদিকে তখন অবাক হয়ে সব দেখছি। কবে পাখীর সঙ্গে এ-ভদ্রলোকের বিয়ে হলো, কেমন করে একে যোগাড় করলে তা বুঝতে পারলাম না। শুধু ভাবছিলাম কলকাতা শহরে এ-ও হয়!

সুশান্তর স্ত্রীকে বললাম—চলুন, বাড়ি ফিরে চলুন—

সুশান্তর স্ত্রী কাঁদতে লাগলো।

বলে—কোথায় যাবো? আমার যে আর যাবার জায়গাও নেই। দু'দিন বাদে যে শাশুড়ির হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হবে—

—কেন। সুশান্ত আছে, সে-ই দেখবে।

সুশান্তর স্ত্রী বললে—সে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, কেউ জানে না। তার কোনও সন্ধান কেউ দিতে পারছে না—

তবু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেদিন সুশান্তর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু মাস খানেক পরেই সে-বাড়িও তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বেহালা কিংবা যাদবপুরে গিয়ে কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে শেষের দিকে দিন কাটাতে হয়েছিল।

তারপর? তারপর অনেক দিন পরে সুশান্ত একদিন এসে হাজির হয়েছিল আমার বাড়িতে। তখন তার মা মারা গেছে। এখন সুশান্ত সান্যাল বলে কোনও লেখকের নাম আপনারা জানেন না। ক'দিন আগে আবার আমার কাছে হঠাৎ একদিন এসেছিল। দেখলাম, এই ক'বছরেই সে যেন একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সেই তার

টাকায় কেনা মধু গুপ্ত লেনের বাড়িতে সেই পাখী, তার মা, তার স্বামী বেশ সুখেই আছে।

অথচ সুশান্তর অবস্থা দেখে মায়া হলো।

বললাম—কেমন আছিস তুই সুশান্ত?

সুশান্ত বললে—শুনছি গভর্মেণ্ট এখন বুড়ো সাহিত্যিকদের কী একটা পেন্‌শন্ দিচ্ছে, একশো-দুশো টাকা করে মাসে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, আমাকে পাইয়ে দিতে পারিস? আমিও তো এককালে লিখতাম। আমার "হলুদ ফুল" বইটা তো এককালে খুব নামও করেছিল—

আমি কী উত্তর দেবো? আমার পক্ষে এ-কথার উত্তর দেওয়া কি সম্ভব?

এরপরে আমি তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখিনি। রাখতে পারিনি বলেই রাখিনি। সে আজ বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।

পরিণয়ের এ পরিণতি আমি যেন আগেই কল্পনা করতে পেরেছিলাম।

প্রেম আর পরিণয় তো হলো। এবার ইত্যাদি।

ব্যাকরণে ইত্যাদি হলো অব্যয়। তার মানে ইহা এবং এইরকম আরো। জীবনের সমস্যা যেমন একটা নয়, সেই সমস্যার সমাধানও এক রকম হতে পারে না। নিস্পৃহ হয়ে কাজ করার কথা তো শাস্ত্রে আছে। সেটা উপদেশ। তাই পৃথিবীর ইতিহাস হলো উপদেশ না-শোনার ইতিহাস। উপদেশ দেবার লোক মুষ্টিমেয়, কিন্তু উপদেশ না-শোনার লোক অসংখ্য। সেই অসংখ্য জনসাধারণের জন্যেই

সাহিত্য, মুষ্টিমেয়র জন্যে নয়। তাই প্রেম আর পরিণয়ের মত আরো একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম হলো এই স্পৃহা। সবকিছুকে অতিক্রম করে প্রথম হওয়ার স্পৃহা। প্রথম হতে হবে। দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় নয়, একেবারে প্রথম। প্রথম হওয়ার গৌরব শিরোধার্য করবার জন্যে মানুষকে কী অপরিমেয় মূল্য দিতে হয় তার কত দৃষ্টান্ত দেবো?

আপনি আমি সবাই জীবনের প্রথম সারির প্রথম স্থানটি অধিকার করবার জন্যে উদয়াস্ত সংগ্রাম করছি। কেউ সশরীরে ছুটছি, কেউ মনে মনে ছুটছি। ছুটছি আমরা সবাই-ই। অফিসের শ্রেষ্ঠ চাকরিটি আমার চাই। গৌরবের শ্রেষ্ঠ সম্মানটি আমার চাই।

আর একটা গল্প শোনাবো আপনাদের। আমাদের অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা। জীবনের সমস্ত কিছু অনাচার আর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা যত চেষ্টা করছি, যত উপায় উদ্ভাবন করছি, তত আরো দুঃখ-কষ্ট, আরো যন্ত্রণার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা আরো চাই। আরো সুখ, আরো টাকা, আরো ঐশ্বর্য, আরো সম্পত্তি। যা আছে আমাদের তার চেয়ে আরো বেশি না পেলে যেন আমাদের শান্তি হবে না। কিন্তু আরো কতটা হলে আমাদের তৃপ্তি হবে? আরোর মাপটা কত? যদি টাকার কথাই ধরা যায় তো কত টাকা? এক হাজার? দশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার? এক লাখ? এক কোটি?

কোটির অঙ্ক লিখতে গেলে একের পর ক'টা শূন্য লাগে তাও আমরা হিসেব করে হয়তো বলতে পারবো না। কিন্তু তবু আমরা কোটি-কোটি টাকাই চাই।

যখন বৌবাজারের 'মহাবীর সঙ্ঘ' প্রথম তৈরি হয়েছিল তখন স্বদেশী যুগ। ছেলেদের লাঠিখেলা ছোরাখেলা শেখানো হতো মহং

উদ্দেশ্য নিয়ে। যাতে শরীর ভালো হয়, যাতে তারা মানুষ হয় সেই
উদ্দেশ্য নিয়ে। যাতে শরীর ভালো হয়, যাতে তারা সত্যিকারের মানুষ
হয় সেই উদ্দেশ্য ছিল ক্লাবের কর্মকর্তাদেরও। ইংরেজদের অত্যাচার
থেকে দেশকে স্বাধীন করার মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল সেইসব মহাপুরুষদের।
কিন্তু আস্তে আস্তে সব বদলে গেল। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই
স্পোর্টিং ক্লাব-এর ভোল একেবারে বদলে গেল রাতারাতি।

সেই সময়ে ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হলেন ভাগবত হালদার।

পাড়ায় তিনি নতুন লোক। যখন বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তিনি পেয়েছিলেন নুনের কনট্র্যাক্ট। সারা বাংলাদেশকে তিনি নুন খাইয়েছেন। যাতে বাঙালীরা নিমক-হারামী না করতে পারে তার জন্যে সেই মুসলিম লীগের আমলেই এম-এল-এ হলেন। হয়ে প্রাণপণে দেশের সেবা করতে লাগলেন। বুঝি তাতেও তাঁর সাধ মিটলো না। পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর তো ভোট হয়। পাঁচ বছরের পরের কথা ভেবেই তিনি দু'হাতে দান-ধ্যান করতে লাগলেন। তখন থেকেই এমন বীজ পুঁততে লাগলেন যাতে পাঁচ বছর পর পর তার ফল ভোগ করতে পারেন। ছোটখাটো ব্যাপারেও খবরের কাগজে নাম ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি কবে কোন্ সভায় সভাপতি হলেন, কী বক্তৃতা দিলেন তার বিবরণ খবরের কাগজে বেরোতে লাগলো।

লোকে বলতে লাগলো—ভাগবত হালদার লোকটি অমায়িক ভদ্রলোক—

তখন তাঁর কাছে যে যে-কাজে যেতো কেউ আর বিফল হয়ে ফিরতো না। চাঁদাই হোক আর চাকরিই হোক, তিনি তাদের জন্যে যথাসাধ্য করতেন। সকলের বিপদে-আপদে সাহায্য করতেন।

কিন্তু মানুষের লোভের বোধহয় আর শেষ নেই।

টাকার যেমন লোভ থাকে, খ্যাতির লোভ তো তার চেয়ে কম নয়!

সেই খ্যাতির লোভেই ভাগবত হালদার একদিন বৌবাজারের স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন।

মুখে বললেন—আমাকে আবার কেন হে? আমি তো সামান্য লোক—

ভাগবত হালদার মুখে বরাবরই বিনয়ী। কিন্তু বাইরে থেকে ধরবার উপায় নেই। বড় আস্তে আস্তে তিনি এগোন। পাঁচ বছর পরে যদি তিনি ভোটে দাঁড়াতে চান তো দশ বছর আগে থেকে তার আয়োজন চলে। দশ বছর আগে থেকেই হঠাৎ দয়ালু সেজে বসেন, ক্লাবে ক্লাবে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তখন ভোট অনেক দূরে। তাই কেউ মতলবটা বুঝতে পারে না। ভাগবত হালদারের মহানুভবতায় সবাই মুগ্ধ হয়, শিষ্য-প্রশিষ্য জোটে। তখন রীতিমত একটা ভক্ত-মণ্ডলী গড়ে ওঠে। তারাই ভাগবত হালদারের জয়ধ্বনি করে বেড়ায়।

ঠিক এমনি কাণ্ড ঘটলো সেবারেও।

পাড়ার মাতব্বররা এসে ধরলো—না হালদার-মশাই, আপনার আপত্তি শুনছিনে। আপনাকে প্রেসিডেন্ট হতেই হবে—

এ-ধরনের লীডার হওয়ার একটা পদ্ধতি আছে।

প্রথমে পাড়ার সরস্বতী পুজোর হিড়িক। সেখানে একটা সভা করতে হয়। সেই সভায় মোটা চাঁদা দিতে হয়। তারপরে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

ভাগবত হালদার এমনি করেই জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে সশরীরে বিরাজ করছিলেন। কিন্তু তবু যেন মনে সন্দেহ হলো। আর একটু উঠলে ভালো হতো। এই ধরো, আরো কয়েকটা ধাপ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কি শেষ আছে? আর কয়েকটা ধাপ উঠলেই তিনি একেবারে সকলের নাগালের বাইরে চলে যাবেন তখন আর কেউ তাকে টেনেও নিচে নামাতে পারবে না।

এমন সময় একজন এসে প্রস্তাবটা দিলে। প্রস্তাব মানে অনুরোধ পাড়ার স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবার অনুরোধ। প্রথমেই রাজী

হয়ে গেলে জিনিসটা লোভের মত দেখায়। তাই একটু পীড়াপীড়ি করতেই নিমরাজী হয়ে গেলেন।

বললেন—ঠিক আছে, তোমরা যখন অত করে ধরছো তখন আর 'না' করি কী করে? হলুম প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কাজকর্ম কিছু করতে পারবো না হে—

ভক্তরা বললে—কাজ আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনার নামটা মাথায় ছাপানো থাকলেই যথেষ্ট।

গোড়াতে এই পর্যন্তই হয়েছিল। এইভাবেই সব জিনিসের সূত্রপাত হয়। সামান্যই একদিন এমনি করে অসামান্য রূপ নিয়ে গড়ে ওঠে। 'মহাবীর সঙ্ঘ' এই রকম করেই এ-পাড়ায় প্রথম গজিয়ে উঠেছিল। এ-পাড়ার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর শ্রীবৃদ্ধির দিকে নজর রেখেই ক্লাবটার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কিন্তু সে আজ অনেককাল আগেকার কথা। তারপর এই মহাবীর সঙ্ঘের দিকে অনেকের নজর পড়েছে। বহু নামজাদা লোক এর কাঁধে ভর দিয়েই সমাজের আর রাষ্ট্রের চূড়ায় উঠেছে। মহাবীর সঙ্ঘের ক্লাবের ভেতরে সে-সব মহাপুরুষদের নামের তালিকা ছাপানো আছে। সবাই এই ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক, সবাই শুভানুধ্যায়ী, সবাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এখান থেকেই সামান্য ভলান্টিয়ার হয়ে পরে এম-এল-এ হয়েছেন। গত তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ কেউ আবার মিনিস্টারও হয়ে গেছেন।

সেদিন মহাবীর সঙ্ঘের বার্ষিক স্পোর্টস্।

সকাল থেকে ছেলেরা দৌড়চ্ছে। সেই আগের দিন রাত বারোটার সময় রাস্তায় সাদা রং দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছে। এ-পাড়ায় শঙ্কর বোস রোডের ক্লাব থেকে শুরু হবে দৌড়। ক্লাবের ছেলেরা ভোর চারটের সময় এসে হাজির হয়েছিল। তখনও পাড়ার

কারো ঘুম ভাঙেনি। সকলের গায়ে গেঞ্জি, পরনে কালো প্যান্ট, আর বুকে পিঠে নম্বর দেওয়া। বড় বড় অক্ষরে অঙ্কগুলো লেখা। আরম্ভ হয়েছে 'এক' থেকে, 'বারো'তে শেষ। মোট বারো জন।

মহাবীর সঙ্ঘের সেক্রেটারিও জাঁদরেল ছেলে। সে ভোর-রাত্রেই ভাগবত হালদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির। ভাগবত হালদার আগেই বলে দিয়েছিলেন—আমি কি অত সকালে উঠতে পারবো ?

বিপিন সরকার এ্যাথলেট্ মানুষ। বলেছিল—আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ডেকে আনবো স্যার—

ভাগবত হালদার বলেছিলেন—তুমি তো ডাকবে কিন্তু অত সকালে দাড়ি কামিয়ে রেডি হতে পারবো কি ?

—পারবেন, পারবেন। সোস্যাল-ওয়ার্ক করতে গেলে এ-সব করতে হবে আপনাকে। দেখছেন না লীডাররা দরকার হলে রাত একটায় মীটিং করে আবার ওদিকে ভোর চারটের সময় উঠে প্লেন ধরতে দমদম এয়ার-পোর্টে যায়।

তারপর একটু থেমে বলেছিল—আর তেমন যদি মনে করেন আগের দিন রাত্তির বেলা শোবার আগে ইশবগুলের ভুষি খেয়ে শোবেন—

কথাটা মনঃপূত হয়েছিল ভাগবত হালদারের। বরাবর কারবার করে এসেছেন। ভোরবেলা ওঠবার দরকার হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে সোস্যাল-ওয়ার্ক শুরু করেছেন সেইদিন থেকেই এই সকালে ওঠার ঝামেলা হয়েছে। ওই অত সকালে বাথরুম সেরে দাড়ি কামিয়ে টুপি-জামা-কাপড় পরে বেরোনোটাই তো এক মহা-ঝামেলা।

তা বিপিন সরকার বড় করিতকর্মা লোক।

বলতে গেলে বিপিনই ভাগবত হালদারকে এ-লাইনে এনেছে। এই পলিটিক্সের লাইনে।

বিপিনই বার বার বলতো—টাকা তো অনেক করলেন ভাগবত-

বাবু, এবার একটু আখেরের কাজ করুন—

—আখেরের কাজ ? আখেরের কাজ তো করি আমি !

ভাগবত হালদার ভাবতেন দুর্ভিক্ষ-ফাণ্ডে কিছু চাঁদা দেওয়া, কিংবা মেয়েদের ইস্কুলের প্রাইজ দেওয়া, কিংবা যাদবপুর টি-বি স্যানাটোরিয়ামে চারটে ফ্রি-বেড করে দেওয়া, এইগুলোই হচ্ছে আখেরের কাজ। এ-কাজ তিনি অনেক করেছেন। অনেক টাকা হয়ে গেলে অমন চ্যারিটি করা নিয়ম। ওগুলো করলে মন ভাল থাকে। ছোট-বড় জ্ঞাত-অজ্ঞাত অনেক পাপ ওতে ধুয়ে-মুছে যায়। আর লোকে যেমন পরলোকের কথা বলে, তেমনি পরলোক বলে যদি কিছু থাকে তো সেখানেও কিছু সুবিধে হতে পারে। গিয়ে অন্ততঃ তার দয়া-দাক্ষিণ্যেরও একটা তালিকা দেওয়া চলে।

বিপিন সরকার বলেছিল—আজ্ঞে আমি তা বলছি না, বলছি পলিটিক্সের কথা—

—পলিটিক্স ? তার মানে ?

বিপিন বলেছিল—কেন, আজকাল তো বিজনেসম্যানরা সবাই তাই করছে। এই দেখুন না গোবিন্দপদবাবু! ওই গোবিন্দপদবাবুর বড়বাজারে মাদুরের দোকান ছিল। মেদিনীপুরের মাদুর আমদানি করার হোলসেল স্টকিস্ট্ ছিলেন, ওই ব্যবসা থেকে ধরলেন ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট বিজনেস, তারপর তার থেকে এখন হয়ে গেছেন মেয়র—

কথাটা ভেবে দেখলেন ভাগবত হালদার। কেন এমন হয়! ঘরের খেয়ে কেউ বনের মোষ তাড়াতে যায় ?

বিপিন সরকারই তখন কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছিল—ওতে যে নিজের কারবারেরই সুবিধে হয় ভাগবতবাবু, কারবার করে উন্নতি করতে গেলে এখনকার দিনে পলিটিক্স করতে হয়। তাতে পারমিট-লাইসেন্স্ পেতে সুবিধে, তারপর রেফারেন্স্! কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কী করেন ? না মেদিনীপুরের মাদুরের ব্যবসা। তাতে তো ইজ্জত বাড়ে না। তার চেয়ে যদি বলেন এম-পি, কিংবা

এম-এল-সি, তাতে আপনার প্রেস্টিজ বাড়বে—

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত। সেই তখন থেকেই ভাগবত হালদার এ-লাইনে এসেছেন। এসে একে একে ইস্কুলের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটার হয়েছেন, কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, পাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর চীফ-পেট্রন হয়েছেন; তারপর আস্তে আস্তে করপোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছেন, আর তারপর এ্যাসেম্‌ব্লির এম-এল-এ। এবার সামনে আবার ভোট আসছে—

ভাগবত হালদার বললেন—ঠিক আছে, আমি আজ রাত্রেই এক গেলাস ইশবগুলের ভুষির শরবৎ খেয়ে রাখবো, তারপর ঘড়িতেও এ্যালার্ম দিয়ে রাখবো, ভোরবেলা তুমি ডাকলেই আমি হাজির হবো গিয়ে—

বিপিন সরকার বললে—হ্যাঁ, মানে আপনাকে আমি মিছিমিছি ট্রাবল্‌ দিতে চাই না, কিন্তু সামনের ফেব্রুয়ারিতেই ইলেক্‌শান, এখন থেকে ফিল্‌ড-ওয়ার্ক না করলে···

তা শেষ পর্যন্ত কাল সেই ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গিয়েছিল।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো,···

—দুলাল? দুলাল কোথায় গেল? বারো নম্বর?

—এই যে বিপিনদা, এই যে—

অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না চারদিকে। কনকনে শীতের ভোর। বড় ঠাণ্ডা চারদিকে। কিন্তু এতটুকু উৎসাহের অভাব নেই কারো। সকলের স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো না করলে দেশের ছেলেদের মনও উঁচু হবে না। এইসব কথাই বোঝানো হয়েছিল ভাগবত হালদারকে।

ভাগবত হালদার বলেছিলেন—ছেলেদের বুঝিয়ে দেবে যে এতে আমাদের কোনও স্বার্থ নেই, তাদের ভালোর জন্যেই আমরা

মহাবীর সঙ্ঘ তৈরি করেছি—

কিন্তু মুশকিল হয়েছিল তুলালের বাড়িতে।

হরিবিলাস অতটা বুঝতে পারেনি প্রথমে। প্রথমে যখন কানে গেল কথাটা তখন বললে—কেন? অত সকালে দৌড়বি কেন?

তুলাল বাপকে ভয় করে। বললে—সকালেই তো দৌড়টা হবে। তা না হলে রাস্তায় গাড়ি-টাড়ি চলতে আরম্ভ করবে যে—

হরিবিলাস কিছু বললে না, শুধু চুপ করে রইলো। পেটে খাওয়া নেই, শুধু দৌড়নো। দৌড়লেই কি আর স্বাস্থ্য ভালো হয়! খাওয়া চাই। যা ইচ্ছে করুক গে। আমার কী!

রাত্তিরে এক-একদিন কথা হতো বউ-এর সঙ্গে। দিনের মধ্যে কতক্ষণই বা দেখা হতো। তবু বিছানায় যখন আসতো তখন একেবারে মড়া হয়ে থাকতো। শুধু শোওয়াটুকুর যা অপেক্ষা! তারপর কখন চোখ তুটো বুজে আসতো, হরিবিলাসও তা বুঝতে পারতো না। যখন ভোরের দিকে চোখ খুলতো তখন কল্যাণী উঠে গেছে। সেই অত ভোরেই উনুনে আগুন দিতে হয়! হরিবিলাসের কারখানা আবার আটটার সময়ই খোলে।

সেই যে ভোরবেলা কল্যাণীর দৌড় শুরু হয়, সে সারাদিনে আর থামে না। তু'খানা ভাড়াটে ঘরের মধ্যেই দৌড়তে-দৌড়তে বুক ব্যথা করে ওঠে, হাঁফায় সে। কাজ করতে করতেই সে এক-একবার নিজের মনে বলে—ওঃ, মা গো, আর পারি না—

তা হরিবিলাসই কি পারে? এ যুগে যদি কেউ সত্যিই পারে তো সে মহাপুরুষ। ভাত আর ডাল তো মাত্র সম্বল। তাই জোটাতেই মাইনের সবটা বেরিয়ে যায়। বাজারে গেলে হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে আসে।

সপ্তাহে একটা দিন ছুটি। সেটা রবিবার।

কিন্তু এমন আইন হয়েছে যে, রবিবারেই দোকানগুলো বন্ধ। সরযূপ্রসাদের মুদি দোকানের মাস-কাবারি খদ্দের হরিবিলাস।

—ডাল কত করে সরযূপ্রসাদ ?

সরযূপ্রসাদের কথা বলবার সময় থাকে না কোনও দিন। তার দোকানেই পাড়ার লোকের যত ভিড়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খদ্দের গিয়ে মাছির মত ভন্-ভন্ করে চারদিকে। কিনবে হয়তো দশ পয়সার মশলা, কি আড়াই শো সরষের তেল, কিন্তু এক ঘণ্টার আগে কেউ মাল পাবে না।

—ও সরযূপ্রসাদ, ডালের কী দর ?

ডালের দাম বলবার কি আর সময় আছে সরযূপ্রসাদের! সে-ও তো দৌড়ুচ্ছে, মানে টাকা-আনা-পাই-এর দৌড়ে ফার্স্ট হতে চাইছে। সে-ও তো সেই ভোরবেলা দোকান খুলেছে, একবার খৈনি খাবার ফুরসতও পায়নি।

তার তখন অনেক্ হিসেব মাথার মধ্যে ঘুরছে।

কবে একদিন সরযূপ্রসাদ আরা জিলা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছেছিল এই শহরে। এই শহরে তখন সবে দৌড় শুরু হয়েছে। তখন প্রথম কাঁচা টাকার দৌড় শুরু হয়েছে এখানে, টাকা উড়ছে। যে দৌড়তে পারবে সে-ই জিতবে, সেই-ই লাভ করবে। আরা জিলার নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে সরে এই রেস-কোর্সের মাঝখানে এসে পৌছেছে। এখানকার হালচাল দেখে তখন তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। সেই তখন থেকেই সে-ও দৌড়তে শুরু করেছিল।

তারপর যত সামনের দিকে দৌড়িয়েছে তত জিতেছে। জিতে জিতে এখন এই পাড়ায় একটা পাকাবাড়ি করেছে। আগে একটা মাটির বাড়ি ছিল, টিনের ছাদ। সেইটিকে এখন দালান বানিয়ে নিয়েছে। ভেতরে গম ভাঙানো কল বসিয়েছে একটা।

—কী গো সরযূপ্রসাদ, তোমার যে কথা বলবারই সময় নেই গো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

কিন্তু বড় মিষ্টি কথা সরযূপ্রসাদের। অন্য খদ্দেরের সওদা ওজন করতে করতেই বলে—একটু দাঁড়ান হরিবাবু, এই দিচ্ছি—

যেন এতটুকু সময় নষ্ট হলেই অন্য দোকানদার বাজিতে ফার্স্ট হয়ে যাবে। তা ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু সরযূপ্রসাদ! এ-পাড়ার দোকানদারদের মধ্যে সরযূপ্রসাদ যত উন্নতি করেছে, আর কেউ তত উন্নতি করতে পারেনি। সরযূপ্রসাদের টিনের বাড়ি এখন পাকাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। একলা মানুষ, মুদিখানাটাও দেখে, আবার গম-ভাঙানো কলটাও দেখে। এক হাতে কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তবু অন্য লোক রাখবে না।

অফিসের পর থলিটা নিয়ে বাজার হয়ে তবে হরিবিলাস বাড়ি ফেরে। একহাতের এক থলিতে তরকারি, আর এক হাতে আটা, মুড়ি, গুড়। কিনতে কিছু আর বাকি থাকে না।

—কী গো, কত করে ডাল, বললে না তো ?

—মুগের ডাল, না মুসুরী ? মুগ আড়াই টাকা, আর মুসুরী সোয়া দুই—

হরিবিলাসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে সরযূপ্রসাদ, সত্যি একেবারে মেরে ফেলবে। আর আমাদের বাঁচতে দেবে না। তার চেয়ে গলাটা কেটে নাও না, চুকে যাক ল্যাঠা—

সরযূপ্রসাদ পাল্লা ধরে অন্য খদ্দেরের মাল ওজন করতে করতেই হেসে বলে—আমাদের আর কারবার করতে দেবে না হুজুর সরকার। দোকান উঠিয়ে দিয়ে ছাড়বে—

—কেন ? কেন ?

হরিবিলাস নিজের মনেই বলে চলে—তোমরাই তো এই গভর্মেণ্টকে ভোট দিয়েছো সরযূপ্রসাদ, এখন তোমরাই এই কথা বললে শুনবো কেন ?

সরযূপ্রসাদের হাতে কাজ মুখে কথা। কথা বলছে, দাম নিচ্ছে, পয়সা গুনছে, সওদা দিচ্ছে। ম্যাজিকের মত কাজ করে যায় সরযূপ্রসাদ।

বলে—আমরা সরকারের কী বুঝি হরিবাবু, আমরা গরীব লোক, যে-সরকার আসবে সেই সরকারই তো আমাদের মাথায় চেপে বসবে—

—তোমরা গরীব লোক? তুমি বলছো কী সরযূপ্রসাদ? হাসালে তুমি!

সরযূপ্রসাদের হঠাৎ তখন হাত খালি হয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে—কী দেবো বলুন, মুগ না মুসুর—

—দাও, মুগই দাও—অন্য ডাল কারোর পেটে সহ্য হয় না। যেটা পেটে সহ্য হয় সেইটেরই তোমরা দাম বাড়িয়ে দেবে তো আমরা কী করবো। আর গুড় দাও আড়াই-শো।

—মুগ ডাল কতটুকু? বলুন, বলুন, শিগ্‌গির বলুন!

এক মিনিট সময় নষ্ট করবার মত অবসর নেই সরযূপ্রসাদের। আড়াই শো ডাল ওজন করে রাখতে না রাখতেই আবার একজনকে জিজ্ঞেস করে—কত, পাঁচশো না এক কিলো?

তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়েই আবার যেতে হয় কয়লার দোকানে। দত্তদের কয়লার গোলায়। দত্তদের ছোটছেলে বাঁটুল দত্ত কয়লার দোকানটা দেখে।

বাঁটুলকে জন্মাতে দেখেছে হরিবিলাস। সেই বাঁটুলই এখন আবার লায়েক হয়েছে। গোঁফ-দাড়ি উঠেছে, দোকানে বসে সিগারেট খায়। তবে সদ্বংশের ছেলে, হরিবিলাসকে দেখে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে।

বলে—আসুন আসুন কাকাবাবু, ভালো কয়লা এসেছে—

হরিবিলাস বলে—ভালো খারাপ বুঝি না, তোমরা যা দেবে তাই-ই নিতে হবে বাপু আমাদের।

বাঁটুল বলে—আমরা আর কী করবো কাকাবাবু, গভর্মেন্ট যা দেবে তাই-ই নিতে হবে। ওয়াগনের ওপর তো আমাদের হাত নেই—

বাঁটুল ভোরবেলা উঠে দৌড়তে দৌড়তে কোন্ একটা অফিসে যায়।

বোধহয় দূরে কোথাও অফিস। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল হরিবিলাস—তুমি কোন্ অফিসে চাকরি করো বাঁটুল ?

বাঁটুল বলেছিল—আজ্ঞে কাকাবাবু, রেশন অফিসে—

—তা রেশন অফিসে এত সকাল-সকাল ?

—আজ্ঞে, আমার অফিস যে চন্দননগরে—

হরিবিলাস অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই কলকাতার এই প্রান্ত থেকে অফিস করতে যায় সেই চন্দননগরে। সারাদিন সেখানে চাকরি করে। আবার ট্রেনে ফেরে। ফিরে এসে দোকানে বসে। আসতে আসতে তার রাত হয়ে যায়। কিন্তু তখন সারাদিনের কয়লার হিসেব নিয়ে বসে। এ-পাড়ার লোক বেশিরভাগই ধারের খদ্দের। নগদে কেউ কেনে না।

হঠাৎ হরিবিলাসবাবুকে দেখে মুখের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে খাতাটা সরিয়ে রাখে।

—কী কাকাবাবু, কয়লা নেবেন ?

হাতের ঝুলিটা নামিয়ে রেখে একটু দম ফেলে নেয় হরিবিলাস।

বলে—এখন তো রাত হয়ে গেছে খুব, এখন দিতে পারবে ?

বাঁটুল বলে—কাল ভোরবেলা যদি দিই, হবে না ?

—হবে না কেন ? রাত্তিরের রান্না তো হয়েই গেছে। কিন্তু কালকের সকালের এক টুকরো কয়লাও আর নেই। কিন্তু খুব ভোরে পাঠানো চাই—

—এই ধরুন সকাল আটটা ?

হরিবিলাস বললে—না বাঁটুল, অত দেরি করে কয়লা পাঠালে চলবে না। কালকে আমার ছেলের স্পোর্টস্—

—স্পোর্টস্ ? কীসের স্পোর্টস্ !

হরিবিলাস বললে—সেই জন্যেই তো বলছি। বড্ড তাড়া আছে। আজ রাত্তিরেই যেমন করে হোক দু-মণ কয়লার ব্যবস্থা করে দাও—ভোরবেলাই ছেলের জন্যে খাবার করে দেবে তোমার কাকীমা।

—কিন্তু ভোরবেলা কিসের স্পোর্টস্‌?

হরিবিলাস বললে—তুমি শোনোনি? ওই যে আমাদের পাড়ার ক্লাবের ব্যাপার। এ-সব ওই ভাগবত হালদার মশাই-এর কাণ্ড। সামনে তো ইলেক্‌শান আসছে—

বাঁটুল জিজ্ঞেস করলে—তা স্পোর্টস্‌-এ কী হবে?

হরিবিলাস বললে—ভোর চারটের সময় উঠে সবাই দৌড়বে।

—দৌড়ে কী হবে?

হরিবিলাস বললে—আমি তো সেই কথাই বললুম দুলালকে, বললুম—দৌড়ে হাতি-ঘোড়া হবেটা কী? দুলাল বললে—সকলের স্বাস্থ্য ভালো হবে। শোনো কাণ্ড! পেটে ভাত নেই, হাঁড়িতে দানা নেই, মুড়ি-চিঁড়ে-দুধ, কিছুই নেই, স্বাস্থ্য হবে দৌড়ে—

বাঁটুল বললে—না কাকাবাবু, আসলে কী জানেন, আসলে ভোটের আগে ভাগবতবাবু ক্লাবের ছেলেদের হাত করতে চাইছেন—

হরিবিলাস বললে—যাক গে, যার যা ইচ্ছে করুক গে বাবা, আমাদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। তা'হলে তুমি কয়লাটার ব্যবস্থা করো—

বাঁটুল দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—এখন তো আর কুলির ব্যবস্থা করতে পারবো না, দেখি ঠেলার বন্দোবস্ত করতে পারি কি না—

হরিবিলাস আর দাঁড়ালো না। সেই সকালবেলা অফিসে গেছে। তারপর বাসে ঝুলতে-ঝুলতে এসে নেমে এখন ঠোক্কর খেতে খেতে কখন বাড়ি পৌছোবে তার ঠিক নেই।

হঠাৎ মনে হলো সাবানটা তো কেনা হলো না। অথচ সাবান কাল সকালবেলা চাই-ই। কাপড়-কাচা সাবান। আর বাড়িতেও সব এমন হয়েছে, একেবারে ফুরিয়ে না গেলে আর তার কথা মনে পড়বে না।

—এই যে, কী হরিবিলাস, এখন অফিস থেকে ফিরছো?

পাড়ার লোক। এককালে এক ক্লাশে পড়েছে হরিবিলাসের সঙ্গে।

বিচক্ষণ মানুষ। পঙ্কজভূষণ চট্টোপাধ্যায়। অনেকদিন ধরে কারবার করে আসছে।

হরিবিলাস বললে—এই ভাই, নাকে দড়ি দিয়ে চলছি—তা তুমি কোথায়?

পঙ্কজবাবু বললে— এই একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।

—হাঁটতে? কেন?

—আর কেন, ডাক্তার বলেছে। ক্ষিদে চলে গেছে একেবারে। মোটে ক্ষিদে হয় না ভাই।

হরিবিলাস বললে—আর আমাদের হলো ঠিক উল্টো। খেতে পাইনে পেট ভরে। এই দেখ না, আড়াই টাকা কিলো মুগের ডাল। খাবোটা কী?

পঙ্কজবাবু বললে—ডাক্তার বলছে মুরগী খেতে—মুরগী কী করে খাই বলো। হিন্দুর ছেলে হয়ে মুরগী তো খেতে পারি না!

—তোমাদের কীসের ভাবনা পঙ্কজ, টাকা ফেলবে আর খাবে। ডাক্তার যেমন-যেমন বলবে তেমনি তেমনি খাবে। এই দেখ না, ছেলের আবার কালকে স্পোর্টস্—

—স্পোর্টস্? তার মানে?

হরিবিলাস বললে—ওই কী ক্লাব আছে না পাড়ায়, তাদেরই বার্ষিক স্পোর্টস্ হবে কাল ভোরে, লম্বা দৌড় হবে, ছেলে সেখানে নাম দিয়েছে—

পঙ্কজবাবু বললে—ওই ভাগবতবাবুর ব্যাপার—

—ভাগবতবাবু আর আছে সেক্রেটারি বিপিন সরকার—

পঙ্কজবাবু বললে—তা ক্ষতি কী। ওতে তোমার ছেলের আর লোকসান কী? স্বাস্থ্য ভাল হবে, নানান লোকের সঙ্গে মেলামেশা হবে। আজকাল মেলামেশা না করলে কিছুই হবে না। শুধু লেখাপড়া করলে তোমাদের মত হয়ে থাকবে।

হরিবিলাস বললে—তা যা বলেছো। আমি বি. এ.-তে অনার্স

পেয়েছিলুম, খুব ভাল ইংরিজী লিখতে পারতুম এককালে—

পঙ্কজ বেশি লেখাপড়া করেনি। কিন্তু অনায়াসে অর্থ উপায় করেছে, গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছে। সিমেণ্ট আর লোহার কারবার করে নিশ্বাস ফেলবার সময় পায়নি কখনও। একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়তে পড়তে ফেল করেছে, আর শেষকালে ট্রাম-রাস্তার মোড়ে একটা টিনের চালার তলায় দোকানটা শুরু করেছিল সেই যে দোকানে গিয়ে বসতো ভোরবেলা, উঠতো একেবারে রাত বারোটার সময়।

যখন হরিবিলাস রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়েছে, ইংরিজীতে ফার্স্ট হয়েছে, তখন হিসেবের খাতা নিয়ে মশগুল হয়ে থেকেছে পঙ্কজ। সেই দোকান আস্তে আস্তে বড় হয়েছে, তারপর যুদ্ধের সময় আর হাঁফ ছেড়ে ওঠবার সময় পেতো না। ওই সরযূপ্রসাদের মতই দোকানে বসে কেবল ছুটে বেড়িয়েছে। একবার চোদ্দ টাকা হন্দর, তারপরই একেবারে তিনশো টাকা। দরও উঠেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজও উঠেছে। উঠেছে মানে একেবারে মাটির তলা থেকে আকাশ ফুঁড়ে আকাশের ওপরেও যদি কিছু থাকে সেখানে গিয়ে মাথা ঠেকিয়েছে।

এর আগেও হরিবিলাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখন হয়তো হরিবিলাস অফিস যাচ্ছে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে।

দোকানে বসে তখন পঙ্কজ চাটুজ্যে হন্দরের হিসেব কষছে একবার চোখ তুলতেই নজর পড়লো রাস্তার দিকে। দেখলে হরিবিলাস বাসে ওঠবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী গো, কী খবর ?

হরিবিলাস বলেছে—অফিস যাচ্ছি ভাই—

হরিবিলাস যখন অফিসে পাঁচ টাকা ইনক্রিমেণ্টের জন্যে আকাশ পাতাল দৌড়চ্ছে, কেমন করে বছরে পাঁচ টাকা ইনক্রিমেণ্ট হয় তার জন্যে জীবন-যৌবন জলাঞ্জলি দিচ্ছে, ঠিক তখন পঙ্কজ লাখ টাকার জন্যে

তেমনি করেই আকাশ-পাতাল করছে। দোকানের ছোট তক্তপোষের ওপর পাতা মাদুরটার ওপর বসে সামনে হিসেবের জাব্দা-খাতা আর ক্যাশবাক্স নিয়ে হাওয়াই-জাহাজ ছুটিয়েছে আকাশে।

সে-সব পুরোন ইতিহাস। এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। এখনও দৌড়োয় পঙ্কজ। কিন্তু সে অন্যরকম দৌড়নো। এখন দোকানে বড় ছেলেকে বসিয়েছে। সেই ছেলেই এখন দৌড়চ্ছে দোকানে বসে বসে। আর রাস্তায় দৌড়চ্ছে পঙ্কজ। ডাক্তার বলেছে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাঁটতে হবে। ব্লাডে সুগার যত বাড়বে তত হাঁটতে হবে। সকালবেলা মাইল চারেক আর রাত্রে মাইল দুয়েক।

ডাক্তার বলতো—বড্ড বেশি সুগার হয়ে গেছে আপনার, সাবধান না হলে কিন্তু মুশকিল হবে—

পঙ্কজ চাটুজ্যে বলতো—এত সুগার হলো কেন বলো তো ডাক্তার?

ডাক্তার বলতো—কেবল দোকানে বসে বসে টাকা উপায় করেছেন, সুগার হবে না?

পঙ্কজ চাটুজ্যে বলতো—আরে আমি আবার বসে থেকেছি কবে? সারাজীবন বসতেই পাইনি স্থির হয়ে। সিমেণ্ট আর লোহার কারবারে কি বসবার ফুরসত আছে ডাক্তার?

ডাক্তার হাসতো। বলতো—ওরই নাম বসা। জীবনে কখনও আড্ডা দিলেন না, কখনও একটা সিনেমা দেখলেন না, একটু মদ পর্যন্ত খেলেন না—

ভয়ে আঁতকে উঠতো পঙ্কজ চাটুজ্যে, বলতো—বলো কী ডাক্তার, আমি মদ খাবো? আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখা, মদ খাওয়া, ও-সব কি ভালো জিনিস?

ডাক্তার বলতো—হ্যাঁ চাটুজ্যে মশাই, ভালো। এমন কিছু কাজ করা উচিত ছিল আপনার যাতে টাকা খরচ হয়। তা তো করেননি, কেবল টাকা উপায়ই করে গেছেন, সেইজন্যেই আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে—

শুনে অবাক হয়ে যেতো পঙ্কজ চাটুজ্যে। বলতো—এ যে তোমাদের নতুন আইন হলো ডাক্তার। ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি মদ খাওয়া খারাপ আর তুমি বলছো ভালো !

তা সেই থেকেই নিয়ম হয়েছিল সকালে বিকেল হাঁটতে হবে। গাড়ি চড়া ছেড়ে দিতে হবে। ডাক্তার বলতো—ওই গাড়িই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া। এই যে এত করোনারী থ্রম্বোসিস, এত ব্লাডপ্রেসার, এত ডায়াবেটিস বাড়ছে, সকলের মূলে ওই গাড়ি গাড়ি আর জীবনে চড়তে পারবেন না—

হঠাৎ পঙ্কজ চাটুজ্জে জিজ্ঞেস করলে—তোমার স্যুগার-টুগার আছে নাকি হে ?

হরিবিলাস বুঝতে পারলে না কথাটা। বললে—স্যুগার ? কিসের স্যুগার ? চিনি ?

—না হে না, সে-স্যুগারের কথা বলছি না। ব্লাডে স্যুগার আছে ? পেচ্ছাবে ?

এতক্ষণে বুঝতে পারলো হরিবিলাস।

বললে—না ভাই, রক্ষে করো, ও-সব উৎপাত এখনও শুরু হয়নি। আমাদের বলে পেট ভরে ভাতই জোটে না, তায় চিনি। আজকাল ভাতই জুটছে না, কেবল রুটি খেয়ে খেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা বেরোই, আর এই এখন আসছি, ফেরবার পথে সরযূপ্রসাদের দোকান্ থেকে ডাল কিনেছি, এখন গিয়েছিলুম বাঁটুলের দোকানে কয়লা কিনতে—এর পর যাবো ডাইং-ক্লিনিংয়ে—তারপর বাড়ি—

—ঘুম ভাল হয় ?

হরিবিলাস বললে—ওসব বালাই আমার নেই—শুধু বিছানায় শুতে যা দেরি।

—ক্ষিধে ?

হরিবিলাস বললে—কী যে বলো তার ঠিক নেই। পেট ভরে এই ছ'মাস ভাত খেতে পাচ্ছি, না তা জানো ? সাড়ে তিন টাকা কিলো চাল, হপ্তায় পনেরো-ষোল টাকার চালই কিনতে হয়, তাতেও কুলোতে পারি না—

পঙ্কজ চাটুজ্যে বললে—কেন, রুটি খাও না কেন ? গমের রুটির মধ্যে তো প্রোটিন আছে। বেশি প্রোটিন খেলে তো ডায়াবেটিস হয় না—

—আরে রেখে দাও ভাই ডাইবিটিসের কথা। আমরা ডাইবিটিসে মরবো না। পঁচিশ বছর চাকরি করে এখন সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে হয়েছে, জিনিসপত্তোরের যা দাম হচ্ছে তাতে শেষকালে আমরা না-খেতে পেয়েই মরবো।

পঙ্কজ চাটুজ্যে এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। বললে—যাই ভাই, আমাকে ডাক্তার আবার আট মাইল রোজ হেঁটে বেড়াতে বলেছে মিনিমাম্—

হরিবিলাস বললে—আচ্ছা, তুমি যাও, পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করে ভাই, কিন্তু সংসারের জাঁতাকলে পড়ে···

—ক'টা ছেলেমেয়ে তোমার ?

—একটা।

পঙ্কজ চাটুজ্যে বললে—ওঃ, তাহলে তো তুমি খুব লাকি হে। তোমার যখন একটা ছেলে তখন আর ও-নিয়ে অত ভাবছো কেন ?

হরিবিলাস বললে—একটা ছেলে বলেই তো বেশি ভাবনা ভাই। ছ'টা ছেলে থাকলে তো আর ভাবনার কিছু ছিল না। মরে যাক ঝরে যাক, একটা-না-একটা থাকবেই—

তারপর আর বেশিক্ষণ কথা হলো না। হরিবিলাস আবার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। একটু জোরে জোরে পা চালিয়ে

চলতে লাগলো। করপোরেশনের রাস্তা, এই রাস্তার ওপর দিয়েই দৌড়বে তুলাল কাল সকালবেলা। এত গর্ত হয়েছে যে বেকায়দায় পড়ে গেলে পা মুচকে যেতে পারে। একবার পা মুচকে গেলে তু'মাসের ধাক্কা। আবার পা ভেঙে যেতেও পারে। একবার কোনও কারণে যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তো টাকার দম্‌কা খরচ। ডাক্তারেরও কি সময় আছে? সরল ডাক্তার ভোরবেলা থেকে রোগী দেখতে শুরু করে, তারপর রাত বারোটার আগে আর ছুটি পায় না।

—ও তুলাল, তুলাল!

বাড়ির সামনে এসে হরিবিলাস ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগলো।

সত্যিই, সরল ডাক্তারই বা কী করবে! পাড়ার লোক। এই পাড়াতেই জন্ম। এই পাড়াতেই কর্ম। তিনজন কম্পাউণ্ডার ওষুধ দিতে দিতে হিমসিম খেয়ে যায়। রোগীদের কাছ থেকে পয়সা নেয় না বটে, কিন্তু পুষিয়ে নেয় ওষুধে। বাজারে যে-ওষুধের দাম পাঁচ টাকা, সরল ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে তার দাম সাত টাকা। ওইটুকু লাভ না করলে বিনাপয়সায় ডাক্তারি করবে কেন? আর বাড়িতে ডাকো, তখন ভিজিট নেবে আট টাকা। আট টাকাও নেয় আবার জায়গা বিশেষে চার টাকাও নেয়। কারো কারো কাছ থেকে আবার তু'টাকা। সরল ডাক্তার যখন প্রথম প্র্যাক্‌টিশ শুরু করেছিল তখন রেট ছিল তু'টাকা। যারা আগে তু'টাকা দিতো, তারা এখনও তু'টাকাই দেয়। পাড়ায় যারা নতুন বাসিন্দে তারা সবাই আট টাকাই দেয়। কিন্তু হরিবিলাস দেয় তু'টাকা। ওটা আর বাড়ায়নি। সরল ডাক্তারও টাকা বাড়াবার জন্যে কখনও বলেনি।

—ও তুলাল, তুলাল—কী রে, এত দেরি কেন দরজা খুলতে?

কিন্তু না, যে দরজা খুলে দিলে সে তুলাল নয়, কল্যাণী।

—কী হলো? তোমার এত দেরি যে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে হরিবিলাস বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—তুলাল কোথায় ?

কল্যাণী সদর দরজায় খিল দিয়ে হরিবিলাসের হাত থেকে থলি তুটো নিয়ে নিলে। সারাদিন অফিসে খেটেখুটে এসে আবার এত ভারী মাল বয়ে এনেছে। বললে—তুলালকে সকাল সকাল খাইয়ে-দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছি—

হরিবিলাস জামা খুলতে খুলতে বললে—ডালের দাম খুব বেড়ে গেল, জানো ? আড়াই টাকা কিলো—

—কয়লার কী করলে ?

হরিবিলাস বললে—কয়লার দোকান থেকে ফেরবার সময়েই তো দেরি হয়ে গেল। বাঁটুল ঠেলা-গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিচ্ছে বললে। সামান্য ঠেলা-গাড়ি, তার জন্যে এখন খোসামোদ করতে হয় ! আজকাল লবাব-পুত্তুর হয়ে গেছে সবাই—

হরিবিলাস নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে ধুতিটা বদলে নিলে। তারপর কলতলায় হাত-মুখ ধুতে ঢুকলো।

—এ কী, আজকে কলে জল আসেনি ?

রান্নাঘরের ভেতর থেকে কল্যাণী বললে—জলের জন্যে সারাদিন বড় কষ্ট গেছে—

—কেন ? কলের আবার কী হলো ?

কল্যাণী সেখান থেকেই বলতে লাগলো—বাড়ির মধ্যে থেকে আমি কী বুঝবো বলো ? দোতলার ভাড়াটেরা দেখলাম ভারি নিয়ে এসে জল তোলাচ্ছে। আমিও চার বালতি জল কিনলাম। আট আনা করে নিলে এক ভারি জল—

এক মগ্ জল নিয়ে মুখে দিতে দিতে হরিবিলাস বললে—নাঃ, কলকাতা শহরে আর থাকা যাবে না দেখছি, আজ জল নেই, কাল ট্রাম-বাস নেই, পরশু তেল নেই—

ততক্ষণে রোয়াকের এক কোণে এক থালা ভাত বেড়ে দিয়েছে

কল্যাণী। যতক্ষণ না হরিবিলাস আসে, যতক্ষণ না এসে খেতে বসে ততক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবে। নইলে বেরাল এসে মাছটা বেছে-বেছে টপ্ করে তুলে নিয়ে যাবে।

কাপড় বদলে হরিবিলাস তাড়াতাড়ি এসে বসলো ভাত খেতে।

বললে—জানো, আজকে সেই আমাদের পঙ্কজ চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা হলো—

—কে? পঙ্কজ চাটুজ্যে কে?

—আরে সেই যে, যার কথা তোমায় বলেছিলুম। ম্যাট্রিকও পাস করতে পারলে না। একেবারে অঘা-মারা ছেলে ছিল ক্লাশের মধ্যে। তার সঙ্গে দেখা হওয়াতেই তো দেরি হয়ে গেল। দেখি একেবারে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বুঝলে? তার থেকে আমরা ভালো আছি—

—সে তো খুব বড়লোক শুনেছিলুম।

—আরে বড়লোক হয়ে লাভটা কী হলো?

—আর একখানা রুটি দেবো?

হরিবিলাস বললে—না না, আর খেতে পারবো না। রুটি খেতে আর ভাল লাগে না। তা পঙ্কজ চাটুজ্যের কথাটা শোনো। কী বললে জানো? বললে—ডাক্তার নাকি গাড়ি চড়তে বারণ করে দিয়েছে। দেখ, শান্তি কিছুতেই নেই। পঙ্কজ অত বড়লোক, তখন ওকে দেখে হিংসে হতো, এখন দেখছি আমরা হারিনি। ও-ই হেরে গেল—

খেতে খেতে গল্প করছিল হরিবিলাস। আর পাশে বসে তদারক করছিল কল্যাণী।

কল্যাণী বললে—আর একখানা রুটি দেবো?

হরিবিলাস বললে—না, দাঁত ব্যথা হয়ে গেছে রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে —কবে আবার রেশনে চাল দেবে কে জানে।

তারপর একটু থেমে বললে—দুলাল খেয়েছে?

ছেলের কথা বলতে গেলে আর কিছু মনে থাকে না হরিবিলাসের। ছেলে রোগা হচ্ছে, কিংবা ছেলের লেখাপড়া হচ্ছে না, ছেলে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে কি না, সব কথাই ভাবতে হয় হরিবিলাসকে।

কল্যাণী বললে—আমি সকাল সকাল খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছি—

হরিবিলাস বললে—জানো, পঙ্কজ বলছিল, আসলে ও-সব স্পোর্টস্-টোর্টস্ কিছু নয়। আসলে ওই ভাগবতবাবুর কাণ্ড। ভাগবত হালদারমশাই, ওই যে বিরাট বাড়িটা রাস্তার মোড়ে—উনি নেক্সট্ ইলেক্শানে দাঁড়াচ্ছেন কিনা, তারই তোড়জোড় এইসব—

কল্যাণী এ-সব কথা বোঝে না। বললে—উঠে পড়ো, দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই, কালকে তো আবার খুব ভোরেই তোমাকে উঠতে হবে—

—নিশ্চয়ই!

বলে হরিবিলাস উঠলো। বললে—আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো আমাকে জাগিয়ে দিও—

—তুমি আর উঠে কী করবে? আমি তো আছি। আমিই খোকাকে উঠিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে পাঠিয়ে দেবো।

হরিবিলাস বললে—যেন ঠাণ্ডা না লাগে দেখো, ক'দিন ধরে আবার ভোরবেলাটায় খুব শীত পড়েছে, ওর আবার টন্সিলের ধাত—

বাইরে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

—বাবু!

সদর দরজাব বাইরে কে যেন কড়া নাড়লে।

হরিবিলাস বললে—ওই, বাঁটুলের কয়লার ঠেলা এসেছে—

তাড়াতাড়ি গিয়ে সদর দরজা খুলে দিলে হরিবিলাস। একটা ঠেলা-গাড়িতে করে একবস্তা কয়লা নিয়ে এসেছে।

—এসো, এসো, ভেতরে নিয়ে এসো—

লোকটা বস্তাটা মাথায় করে একেবারে ভেতরে নিয়ে এল। নতুন ঠেলাওয়ালা। আগে কখনও এ-বাড়িতে কয়লা নিয়ে আসেনি, সিঁড়ির নিচেয় ছোট খুপরির মত একটুখানি জায়গা। সেখানেই বাড়ির কয়লা-ঘুঁটে-কাঠ সব থাকে। সেখানেই বস্তাটা ফেলে দিলে লোকটা। তারপর সমস্ত কয়লাটা ঢেলে খালি বস্তাটা নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

বললে—ছ' আনা লাগবে বাবু!

—ছ'আনা! বলো কী? তোমরা যে একেবারে দিনে ডাকাতি আরম্ভ করলে গো।

কুলিটা বললে—না বাবু, রাত দশটা বেজে গেছে, আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। বাঁটুলবাবু নিজে ঠেলে আমাকে তুলে দিয়েছে। ছ'আনা তো কম করে বলেছি—

শেষ পর্যন্ত ছ'-আনাই দিতে হলো।

লোকটা পয়সা ক'টা নিয়ে চলে গেল। হরিবিলাস বললে—যাক বাবা। বাঁটুল দত্ত ছেলেটাকে ভাল বলতে হবে। আজকালকার বাজারে কে কার জন্যে করে!

কল্যাণী বললে—কয়লাটা রাত্তিরেই ভেঙে রাখি—কী বলো, সকালবেলা ঝি আসতে আসতে আবার তখন বেলা হয়ে যাবে—

হরিবিলাস বললে—এই এত রাত্তিরে তুমি নিজে কয়লা ভাঙবে? শব্দে ভাড়াটেদের ঘুম ভেঙে যাবে যে, সবাই হৈ-চৈ করবে।

কল্যাণী বললে—তা তাদের ভয়ে আমি কয়লাও ভাঙতে পারবো না নাকি? আমি বাড়ির ভাড়া দিই না? আমার বাড়ির মধ্যে আমি যা-খুশী করবো, তাতে কার কী?

—না না, থাক, বরং সকাল-সকাল উঠে আমিই ভেঙে দেবো তোমার কয়লা। এখন দুলাল ঘুমোচ্ছে, ওর আবার ঘট্-ঘট্ আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে পারে—

তা বটে। দুলালের জন্যেই তো ভাবনা। হরিবিলাস বললে—এবার তা'হলে তুমি খেয়ে নাও—

কল্যাণীও রান্নাঘরের ভেতর চলে গেল। কল্যাণী যথারীতি খেয়ে-দেয়ে রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনটা বাইরে রেখে দিয়ে ঘরখানা ঝাঁটা দিয়ে ধুয়ে ফেলে রোজ। ততক্ষণে হরিবিলাস সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর লুঙ্গিটা পরে নিজের তক্তপোষটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। ততক্ষণ হরিবিলাস সারা জীবনটা পরিক্রমা করে নেয়। তার মনে হয় সারা জীবনটাই তো সে দৌড়চ্ছে। সারাটা জীবন। সেই যে ছোটবেলায় একদিন দৌড়নো শুরু করেছিল, আজও বোধহয় তা থামেনি। দৌড়তে দৌড়তেই তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। বেঁচে থাকলে আরো কতদিন ধরে দৌড়তে হবে তা কে জানে?

কল্যাণী ঝাঁটা দিয়ে রান্নাঘর ধুচ্ছে, সে-শব্দ এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে হরিবিলাস। ওই কল্যাণীও যেন দৌড়চ্ছে তার সঙ্গে। বিয়ে হওয়া ইস্তক তারই সঙ্গে দৌড়চ্ছে। একটু দম নেবার সময়ও নেই তার। ঘুম থেকে ভোরবেলা ওঠা থেকেই তার দৌড় শুরু হয়। তখন থেকে সে হাঁফায়। তাড়াতাড়ি কলঘরে গিয়ে চান করে কাপড় কেচে বেরিয়ে আসে। তারপরই আসে ঝি। ঝি এল তো ভালো। অর্ধেক দিনই সে আসে না। ঝি না এলে নিজের হাতেই বাসনটা মেজে নিতে হয়। দুলাল দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তাকে উঠিয়ে মুখের কাছে খাবার এগিয়ে দিতে হয়। ওদিকে হরিবিলাস সেই ভোরে উঠেই লাইন দিতে যায় হরিণঘাটার দুধের দোকানে।

দুধ! দুধ নয় তো জল। টোণ্ড্-মিল্ক। আসলে বললেই হয় জল-মেশানো দুধ। তা না বলে বলে টোণ্ড্ মিল্ক। আবার ডবল্ টোণ্ড্ মিল্কও আছে!

কল্যাণী এসে ঘরে ঢুকলো।

—কী গো, সব কাজ শেষ হলো?

কল্যাণী বললো—হ্যাঁ—

হরিবিলাসের মনে হলো কল্যাণী যেন হাঁপাচ্ছে। অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে দম নিচ্ছে। কম দূর! সেই বাইশ বছর আগে দৌড় শুরু হয়েছে কল্যাণীর। বাইশ বছর আগেই বিয়ে হয়েছিল হরিবিলাসের। বিয়ের সময় শুভদৃষ্টিতে হরিবিলাস যে-মুখখানা দেখেছিল, সে-মুখ হারিয়ে গেছে। কিন্তু যা-ও বাকি আছে তা সেই আগেকার কিছুই না।

কল্যাণী তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ভাগবত হালদার বুড়ো হয়েছেন। তিনি অত সকালে আসতে পারেননি। কিন্তু তা বলে আগ্রহ তাঁর এতটুকু কম নয় কারোর চেয়ে। মহাবীর সঙ্ঘে অন্ততঃ তিনশো ছেলে মেম্বার। ভোটের সময় যদি তিনশো ভলান্টিয়ার ফ্রি পাওয়া যায় তাহলে ভোট-বৈতরণী পার হতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

বিপিন সরকারও তাই বলেছিল।

বলেছিল—এ-পাড়ায় আপনাকে আমি আটশো ভোট গ্যারান্টি দিয়ে দিতে পারি—

ভাগবত হালদার বলেছিল—কিন্তু শুধু এ-পাড়ার ভোট পেলে তো হবে না বিপিন, ওই একবালপুরের ভোটের কী হবে? ওদিকে তো আর মহাবীর সঙ্ঘের মেম্বার নেই—

—তাহলে এক কাজ করুন।

বলে বিপিন সরকার একটা মতলব বার করলে।

বললে—একটা দৌড়ের কমপিটিশন করুন। চার মাইল দৌড়তে হবে। চারদিকে পোস্টার এঁটে দিতে হবে বেশ ভাল করে। যারা ফার্স্ট-সেকেণ্ড-থার্ড হবে তারা প্রাইজ পাবে। আমাদের পাড়ার সঙ্গে একবালপুর এরিয়াটাও জুড়ে দেবো। ওদিককার পকেট-

ভোটগুলোও যাতে আপনি পান তার জন্যে ওদিকের দেয়ালে-দেয়ালেও পোস্টার লাগিয়ে দেবো।

ভাগবত হালদার বললেন—তা তো দেবে! কিন্তু আজকালকার বাঙালীরা বড্ড চালাক হয়ে গেছে, তারা কি আর সব বুঝতে পারবে না ভাবছো?

—কী বুঝতে পারবে?

বিপিন সরকার কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কী, বুঝতে পারবেটা কী?

ভাগবত হালদার রেগে গেলেন। বললেন—আরে তুমি একটি নিরেট মুখ্যু। তোমার মাথায় কিচ্ছু বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। আমি হলুম মহাবীর সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, আর তুমি সেক্রেটারি, মহাবীর সঙ্ঘ যদি কমপিটিশন ডাকে তো লোকে বুঝতে পারবে না কি যে, আমি ভোটের জন্যে জমি তৈরি করছি? লোকে কি ঘাস খায়?

বিপিন সরকার বললে—তা বুঝলে আমরা আর কী করতে পারি? আর ভোটে দাঁড়ানো কি খারাপ কাজ? ভোটে দাঁড়ানো কি পাপ?

—আরে, আমি তা বলছি না। লোকে বুঝতে পারবে এইটুকুই শুধু বলছি।

বিপিন সরকার বললে—তা বুঝুক গে। বুঝলে তো বয়ে গেল। টাকা ছড়ালে সবার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের তো আর টাকার অভাব নেই।

ভাগবত হালদার বললেন—কত টাকা লাগবে, হিসেব করেছো কিছু?

বিপিন সরকার বললে—মহাবীর সঙ্ঘের রেস-এর ব্যাপারে?

—আরে না, সে-কথা বলছি না। ছেলেরা দৌড়বে, তাতে আর কত খরচ হবে। বড় জোর পাঁচশো টাকা। সে আমি পরোয়া করি না। ভগবানের আশীর্বাদে টাকার জন্যে জীবনে কখনও আমার

কিছু আটকায়নি। আমি বলছি ভোটের কথা। জেনারেল ইলেক্‌শানে আমার কত খরচ হতে পারে?

বিপিন সরকার বললে—দু'লাখ। দু'লাখের বেশি লাগবে না।

ভাগবত হালদার বললেন—দু' লাখে হবে?

বিপিন সরকার বললে—যদি কিছু বেশি লাগে তো বড়জোর আরো হাজার পাঁচেক টাকা। এম-এল-এ হতে গেলে দু'লাখ টাকার বেশি লাগা উচিত নয়। সেবার আগরওয়ালা সাহেব এম-পি হলো, সব স্বদ্ধু খরচ হলো সাড়ে চার লাখ।

ভাগবত হালদার জিজ্ঞেস করলেন—মহাবীর সঙ্ঘকে কত দিতে হবে আমার?

বিপিন সরকার বললে—প্রথমে হাজার খানেক টাকা দিন, তারপর দেখা যাক আর কত লাগে···

—হাজার খানেক টাকাতে কী হবে?

—কেন, প্রথমে ক্লাবের ঘরখানাকে সারাতে হবে। তাতে লাগবে শ' তিনেক টাকা। তারপর ক্লাবের মেম্বারদের সকলকে খাওয়াতে হবে একদিন। তাতে পড়বে আপনার শ' দু-এক। তারপর ক্লাবের মাঠটা ঠিক করতে হবে। ঘাসগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে, নতুন করে ঘাস বসাতে হবে। ভালো ভালো ফুলের গাছ বসাতে হবে। তাতে আপাততঃ লাগবে শ' পাঁচেক—এই তো গেল হাজার টাকা···

ভাগবত হালদার বললেন—তারপর?

—তারপর কত দিতে হবে তা আপনাকে বলে দেবো। আমার একটা প্ল্যান আছে। ছেলেদের একদিন স্পোর্টসের বন্দোবস্ত করতে হবে।

—তাতে কত টাকা লাগবে?

—সে-সব আপনাকে আমি স্কিম দেবো। এখনও তো ভোটের দেরি আছে। এখন থেকে গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক চালাতে হবে। যেন লোকে

বুঝতে পারে যে আপনি দেশের ছেলেদের জন্য অকাতরে টাকা খরচ আর প্রস্তুত। তা'হলেই অর্ধেক কাজ এগিয়ে যাবে। আসল কথা হলো ফিল্ড্-ওয়ার্ক। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আগেকার দিন-কাল ছিল আলাদা রকম। তখন একশো টাকার প্যাম্ফ্লেট ছাপালেই কাজ হয়ে যেতো। এখন ভোটাররা যে সব সেয়ানা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনি শুধু ভালো লোক হলে চলবে না, এখন আবার টাকাও ছড়াতে হবে—

ভাগবত হলদার বললেন—টাকা তো আমি ছড়াতে রাজী—

বিপিন সরকার বললে—ওই তো, ওইখানেই তো যত গোলমাল। ওই টাকা তো সবাই ছড়াতে পারে। এই কলকাতা শহরে ছড়াবার লোকের কমতি নেই, কিন্তু সবাই টেকনিকটা জানে না। সেই টেকনিকটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো—

—কবে শেখাবে ?

বিপিন সরকার বললে—আপনার আর সে-সব শিখে কী হবে হালদার মশাই, আমি তো রইলুম, আমি যতদিন আছি, ততদিন আপনার ভাবনা কীসের ? আপনি শুধু টাকা দিয়ে যাবেন, আর আমি আপনাকে ঠিক ঠিক ভাউচার দিয়ে যাবো—

তা এই-ই হলো শুরু।

এই যে আজ মহাবীর সঙ্ঘের স্পোর্টস্ হচ্ছে, এই যে ছেলেরা দৌড়চ্ছে, এর সূত্রপাত এইখানে। বিপিন সরকারের বুদ্ধি, আর ভাগবত হালদারের টাকা।

বাকি রইলো নমিনেশান-পেপার, সে-জন্যে ভাবতে হবে না। সে কংগ্রেস-অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করলেই হবে।

সেদিন থেকেই বিপিন তোড়জোড় চালিয়ে এসেছে। মহাবীর সঙ্ঘের পেছনেও অনেক টাকা খরচ করেছেন ভাগবত হালদার। ক্লাবের ঘরে লাইব্রেরীর জন্যে বই কিনে দিয়েছেন। বাগানে মালি রেখে দিয়েছেন। আগে ঝাঁট পড়তো না ক্লাব-ঘরে। উনি প্রেসিডেণ্ট

হবার পর থেকে ঝাঁট পড়ছে। ছেলেরা সকালে-বিকেলে ছোলা-ভিজোনো, মাখন, মিছরি খেতে পাচ্ছে।

সবই হয়েছে আস্তে আস্তে।

আস্তে আস্তে ক্লাবের একটা নিজস্ব বাড়িও হয়েছে। মাথায় এ্যাস্‌বেস্টসের ছাদ হয়েছে। ব্যাজ্ হয়েছে, ইউনিফর্ম হয়েছে ক্লাবের মালি-বয়-ছোকরাদের। ফুটবল-সেকশানে ভালো বল কিনে দিয়েছেন। জুতো দিয়েছেন এগারো-জোড়া। তারপর আছে জার্সি।

হরিবিলাস তুলালের জার্সি-পরা চেহারা দেখে একদিন চিনতেই পারেনি।

ছেলেকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে কাদের-না-কাদের ছেলে বলে ভুল করে ফেলেছিল। বললে—এ কী রে, তুলাল না?

তুলাল বাবাকে দেখে সামনে এগিয়ে এল। সঙ্গের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রইলো দূরে।

হরিবিলাস বললে—কোথায় যাচ্ছিস? বাড়ি চল—

তুলাল বললে—এখন ক্লাবে যাচ্ছি—

—তা'হলে গিয়েছিলি কোথায়? ক্লাবেই তো গিয়েছিলি?

তুলাল বললে—না, ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম—

—এ জামা কে দিলে?

—ক্লাব।

হরিবিলাস ছেলেদের দলটার দিকে চেয়ে দেখলে। সবার গায়েই জার্সি। বেশ রং-চং করা।

তুলাল বললে—এ জার্সি ক্লাবে ছেড়ে রেখে দিয়ে বাড়ি ফিরবো—

—ঠিক আছে, যাও। পায়ে চোট-টোট লাগে-টাগেনি তো?

তুলাল বললে—না—

—হ্যাঁ। খুব সাবধানে ফুটবল-টুটবল খেলবে বাবা। পায়ে যেন চোট-টোট না লাগে।

তুলাল দৌড়তে দৌড়তে আবার চলে গেল ছেলেদের দলের মধ্যে

হরিবিলাস একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সেইদিকে। ভালো খেতে-পরতে না পারলে শরীর ভাল হবে কী করে দুলালের! আড়াই টাকা মুগের ডালের কিলো, দু'শো টাকা চালের মণ। অথচ ছেলে ফুটবল খেলবে, দৌড়বে, গায়ে রং-চঙা জামা পরবে!

হরিবিলাস নিজের মনেই শুধু ভাবে। অফিস যাবার পথেও ভাবে, অফিস থেকে আসতে আসতেও ভাবে। ভেবে ভেবে আর যখন কূল-কিনারা পায় না তখন হতাশ হয়ে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে বলেই হরিবিলাস বেঁচে যায়। এমনি করে যদি কখনও বাহাত্তর ঘণ্টা ঘুমোতে পারতো তো হরিবিলাস যেন বেঁচে যেতো!

কিন্তু তা তো হবার নয়। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে হয় হরিবিলাসকে। উঠেই দুলালের জন্যে দুধ আনতে হয় হরিণঘাটার দুধের দোকান থেকে। সেখানে আবার কিউ পড়ে। একটা যে কথা বলবে কারো সঙ্গে সে সময় থাকে না। মাঝে মাঝে দেখা যায় পঙ্কজ চাটুজ্যে বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস টানতে টানতে প্রাতঃভ্রমণ করতে চলেছে!

পঙ্কজ চাটুজ্যে দূর থেকে বলে—কী হে, দুধ নিতে এসেছো বুঝি?

হরিবিলাস বলে—হ্যাঁ ভাই, পরে দেখা হবে—

পাছে আবার পঙ্কজ দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করিয়ে দেয় তাই আর সেদিকে ফিরে চায় না হরিবিলাস। তখন কেবল মনে পড়ে দুলালের কথা। দুলাল যেন ঘুম থেকে উঠে দুধ খেতে পায়। দুলালের স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে। দুলালকে যেন বড় হয়ে হরিবিলাসের মত আর এমন করে উঞ্ছবৃত্তি না করতে হয়। দুলাল যেন বড় হয়। শুধু বড় নয়, বড়লোকও হয়।

কিন্তু···

কিন্তু কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন ধাক্কা লাগে। ওই পঙ্কজ চাটুজ্যে। পঙ্কজও তো তার বাপ-মা'র চোখে বড় হয়েছে, কিন্তু ওই-ই কি বড় হওয়া? ওরই নাম কি বড়লোক হওয়া? যদি বড়লোক

হলেই ব্লাডপ্রেসার হয় তাহলে দরকার নেই বড়লোক হয়ে। দরকার নেই টাকা হয়ে।

কিন্তু তবু কথাটা ঠিক বরদাস্ত হয় না। বড়লোক হলেই তো ব্লাডপ্রেসার হবে। বড়লোক হলেই তো স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। ওই পঙ্কজ চাটুজ্যের মত নুন খেতে পারবে না, গাড়ি চড়তে পারবে না। চিরকাল সকালে-বিকেলে শুধু স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্যে খোলা হাওয়ায় হাঁটতে হবে।

না না, দুলাল যেন বড় হয়ে বড়লোকই হয়। যেন বড় হয়ে অনেক টাকা উপায় করে। যেন বাবার মত এই উঞ্ছবৃত্তি না করতে হয়। এই একবার দুধের দোকান আর একবার সরযূপ্রসাদের দোকান, এইসব না করতে হয়। যেন সে একটা বাড়ি করে। নিজস্ব টাকায় তৈরি করা বাড়ি। সিমেণ্ট-কংক্রিটের নতুন বাড়ি। বেশ সামনে একটু বাগান থাকবে। সেখানে একপাশে একটা গ্যারেজ। সেই গ্যারেজের ভেতরে দুলালের গাড়ি থাকবে।

আর হরিবিলাস ?

হরিবিলাস নিজে তখন খুব বুড়ো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। হরিবিলাস তখন বাগানে পাইচারি করবে. সকাল-সন্ধ্যেয়। দুলাল গাড়িটা বার করে বাবাকে বলবে—চলো বাবা, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি—

—কে ?

—আরে হরিবিলাস যে ? কী খবর ?

আর একজন বন্ধু। শশীশেখর। হরিবিলাসের সঙ্গে এককালে এক ক্লাশে পড়েছে।

—তুমি তো পাটনা না লক্ষ্ণৌ কোথায় ছিলে! হঠাৎ কলকাতায় কী মনে করে ?

শশীশেখর বললে—এই এসেছি ভাই মেয়ের বিয়ে দিতে—

হরিবিলাস অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী হে? এরই মধ্যে মেয়ের বিয়ে? কত বয়েস হলো মেয়ের?

শশীশেখর বললে—এই তো কুড়ি হলো—

হরিবিলাস বললে—আজকাল কুড়িটা আর এমন কী বয়েস?

শশীশেখর বললে—না, তা ঠিক নয়, একটা ভাল পাত্র পেয়ে গেলাম তাই। মেয়ে তো বিয়েই করতে চাইছিল না।

—কেন, বিয়ে করবে না কেন?

—ওই বলে কে? মেমসাহেবদের কলেজে পড়ে পড়ে ওইসব আইডিয়া হয়েছে আর কি।

—মেমসাহেব মানে?

—মানে, মেয়ে বরাবর তো বিলেতে ছিল।

—বিলেতে?

হরিবিলাস যেন আকাশ থেকে পড়লো। শশীশেখরের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিলে হরিবিলাস। যেন বিশ্বাস হলো না কথাটা। শশীশেখর এত বড়লোক তা তো জানতো না হরিবিলাস। ইণ্ডিয়ায় নয়, একেবারে বিলেতে রেখে পড়িয়েছে মেয়েকে?

—তা বিলেতে যখন পড়িয়েছ তখন সে তো অনেক টাকার ধাক্কা হে!

শশীশেখর বললে—তা মেয়ের যখন জন্ম দিয়েছি তখনই ধরে নিয়েছি ষাট হাজার টাকা তার জন্যে খরচ করতে হবে। আসলে কী হয়েছে ভাই, আমার এক শ্যালক বিলেতে বড় চাকরি করে, সেই শ্যালকই মেয়েকে সেখানে রেখে পড়িয়েছে—

—তা বিয়ে দিতে শেষে এই দেশেই আসতে হলো?

শশীশেখর বললে—বিয়েটা ভাই আত্মীয়-স্বজনের সামনে দিতে হয়। এখানে চিরকালের বাস। আর পাত্রের আত্মীয়-স্বজনও সবাই এখানে। পাত্রটি বড় ভালো—

—কি করে ?

—সে-ও বিলেতে চাকরি করে, এন্‌জিনীয়ার। হাজার পাঁচেক টাকা মাইনে। তারপর স্বাস্থ্য ভালো। আমার শ্যালকই সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে—তোমার আসা চাই কিন্তু ভাই, ঠিক সময়েই চিঠি দিয়ে আসবো। তুমি সেই পুরোন বাড়িতেই আছ তো ?

শশীশেখর চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত কথাটা মাথার মধ্যে ঘুর-ঘুর করতে লাগল। পাঁচ হাজার টাকা মাইনে! পাঁচ হাজার টাকা মাইনে জামাইয়ের! আচ্ছা, পাঁচ হাজার টাকা যারা মাইনে পাচ্ছে, তারা কি সুখী? ব্লাডপ্রেসার হবে নাকি শেষ পর্যন্ত পঙ্কজের মত ? পঙ্কজও তো এককালে পাঁচ হাজার কেন, দশ হাজার টাকা মাসে উপায় করেছে। তার তো এখন এই পরিণাম! সুতরাং দুলাল যদি কোনওদিন পাঁচ হাজাব টাকা পায় তো তারও কি শশীশেখরের জামাইয়ের মত ভালো বিলেত-ফেরত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে ?

বিলেত-ফেরত মেয়ে! বিলেত-ফেরত মেয়ে বাড়িতে বউ হয়ে এলে কী-রকম হবে তাই কল্পনা করে নিয়ে হরিবিলাস বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। বিলেত-ফেরত বউ কি আর শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মান করবে!

—কে ?

বাড়ির ভেতর থেকে কল্যাণী কড়া-নাড়ার শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছে। তবু একবার জিজ্ঞেস করলে—কে ?

—রেডি!

হুইশ্‌ল বেজে উঠলো মহাবীর সঙ্ঘের ভেতরে। অর্থাৎ সবাই তৈরি হও।

ভাগবত হালদারমশাই অত সকালে আসতে পারেননি। বিপিন সরকার বলেছিল—আপনি আর অত সকালে মিছিমিছি কেন

কষ্ট করে আসবেন। আপনার আসার তো দরকার নেই—

ভাগবত হালদার বলেছিলেন—না না, তাতে কী, আমার ক্লাব, আমি প্রেসিডেণ্ট, আমি না এলে খারাপ দেখাবে—তা ছাড়া, সামনে ইলেক্‌শান আসছে, বুঝলে না ?

তা বটে !

বিপিন সরকার বুঝলো কথাটা। সত্যিই তো, ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট নিজে এসে দাঁড়ালে তার একটা গুরুত্ব বাড়ে। তাতে মেম্বাররা খুশী হয়। মেম্বারদের গার্জেনরাও খুশী হয়। তারা বুঝবে যে এটা ইলেক্‌শান স্টাণ্ট্ শুধু নয়, এটার উদ্দেশ্য সৎ, এটার প্রচেষ্টা মহৎ।

তুলাল ভোর-রাত্রেই উঠেছিল।

কল্যাণীর সারা রাতই ঘুম হয়নি বলতে গেলে। কয়লা এসেছে অনেক রাত্রে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে উনুনে ঘুঁটে আর কয়লা সাজিয়ে রেখে দিয়েছিল। তারপর শোওয়া মানে ঠিক ঘুমোন নয়, শুধু চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করা।

তবু ঘুম কি আসে!

রাত তখন তুটো কি তিনটে। পাশে হরিবিলাস শুয়ে ছিল। পাছে হরিবিলাসের ঘুম ভেঙে যায় তাই এ-পাশ ও-পাশ করতেও পারছিল না কল্যাণী।

হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হলো হরিবিলাসের।

জিজ্ঞেস করলে—ঘুমোওনি তুমি ?

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—তুমি ঘুমোওনি ?

হরিবিলাস বললে—না, ঘুম আসছে না মোটে—

—কেন, ঘুম আসছে না কেন ?

হরিবিলাস বললে—ওই কেবল মনে হচ্ছে যদি বেশি ঘুমিয়ে পড়ি, যদি বেশি সকাল হয়ে যায়—

কল্যাণী বললে—না না, তুমি ঘুমোও, সারাদিন খেটেছো, একটু না ঘুমোলে শরীর টিকবে কেন ? অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নাও—

হরিবিলাস বললে—তুমি ঘুমোও, আমি জেগে থাকবো—

কল্যাণী বললে—না, আমার ঘুম আসবে না।

হরিবিলাস বললে—তা'হলে দু'জনে জাগলে কী লাভ হবে? তার চেয়ে তুমি ঘুমোও, আমি জেগে থাকি—

কল্যাণী বললে—ওই শোনো, দোতলায় ওদের বাড়িতে তিনটে বাজলো—

হরিবিলাস বললে—তা বাজুক, তুমি ঘুমোতে চেষ্টা করো—আমি তোমায় একঘণ্টা পরে ঠিক জাগিয়ে দেবো—

মোট-কথা রাত্রে কারোরই আর ঘুম হলো না। ভোর চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হরিবিলাস উঠে পড়েছে। উঠেই ছেলেকে ডেকেছে—ও দুলাল—ওঠ—ওঠ—

বাবা তো জানে না যে দুলাল আগেই জেগে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই দুলালের ঘুম কম। ছোটবেলা থেকেই দুলাল বড় ভাবে। কেন যে এত ভাবে তা বুঝতে পারে না। না ভাবলেই হয়। কিন্তু ভাবতে খুব ভাল লাগে দুলালের।

আরো যখন ছোট ছিল দুলাল, তখন অনেকদিন একা একা পার্কে গিয়ে ভাবতো। অন্য সব ছেলেরা যখন হৈ-হৈ করে ফুটবল খেলতো তখন দুলাল কিছুই করতো না, শুধু ভাবতো। ভাবতো, কেন আকাশে মেঘ হলো, কেন সূর্য ওঠে পুব দিকে।

খেতে বসার পর মা অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছে—কী রে, কী ভাবছিস তুই? খাচ্ছিস না কেন?

তখন হঠাৎ খেয়াল হতো দুলালের। খেতে খেতে কখন যে আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করেছে তার খেয়াল ছিল না। মা'র কথায় তখনই আবার তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তেও এমনি। স্কুলের পাশেই মাঠ। জানলার বাইরের দিকে চোখ চাইলেই শশীনাথদের বিরাট বাড়িটা দেখা যায়। বাড়িটার চিলে-কোঠার ওপরে অনেক সময়ে একটা চিল বসে থাকতে

দেখেছে। কখন বুঝি চিলটা এসে বসেছে। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখছে আরো অনেকগুলো চিল এসে একে একে নামলো।

অঙ্কের মাষ্টার রমেশবাবু চিৎকার করে উঠেছে—এই, তুই যে বাইরের দিকে চেয়ে আছিস? কী দেখছিস? কাদের বাড়ি ওদিকে? ওখানে কী আছে?

তারপর ধমক খেতেই আবার রমেশবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়েছে। দেখেছে তার দিকে চেয়ে সবাই হো হো করে হাসছে।

এরপর দুলাল আরো কিছু বড় হয়েছে। তখন তাকে নিয়ে তার বাবা-মা'র ভয় হয়েছে। এ ছেলেকে নিয়ে তারা কী করবে। এ-ছেলে কেমন করে মানুষ হবে। এখন তো আর সেদিন নেই। এখন একটু ডাকাবুকো না হলে তাদের কপালে অশেষ দুঃখ।

প্রথম-প্রথম হরিবিলাস ছেলেকে নিয়ে বাজারে যেতো।

বলতো—আমি কেমন করে বাজার করি, কেমন করে দোকানীদের সঙ্গে দরদস্তুর করি সব লক্ষ্য করবি, জানিস?

তারপর শেখাতো---আচ্ছা বল তো, সাড়ে পাঁচ টাকা করে তেলের কিলো হলে তিনশো তেলের দাম কত?

এমনি অনেক করে বাবা দুলালকে মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করতো। কিন্তু শেষকালে ভাগ্যের হাতে দুলালকে ছেড়ে দিয়ে হরিবিলাস নিশ্চিন্ত হলো।

বাবা একদিন বললে—না, ও ছেলে তোমার মানুষ হবে না, বুঝলে? এখনও লোকের সঙ্গে ভাল করে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না ও—

বাবা অফিসে চলে গেলে মা বলতো—কী রে, এখনও মানুষ হলি না তুই দুলাল, তোকে নিয়ে আমি কী করবো বল দিকিনি—

দৌড়তে দৌড়তে সেই সব কথাই ভাবছিল দুলাল।

হয়তো রমেশবাবুর কথাই ঠিক। রমেশবাবু বলতো—অঙ্কটাই হলো জীবনে আসল। তোমরা যদি অঙ্ক না পারো তো জীবনে উন্নতি করতে

পারবে না। সে তোমরা ডাক্তারই হও আর ইঞ্জিনীয়ারই হও, আর যা-কিছু হও, অঙ্ক জানা দরকার। এমন কি কবি হতে গেলেও অঙ্ক জানা চাই। অঙ্ক না জানলে ভাল কবিতাও লিখতে পারবে না—

প্রথমে গোবিন্দ আঢ্যি রোড।

মহাবীর সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গোবিন্দ আঢ্যি রোড পড়বে।

আগে এই গোবিন্দ আঢ্যি রোডেই থাকতো তারা।

একদিন একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে দুলালের ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার নাম মণিময়। খুব টুকটুকে ফরসা। দুলাল কালো আর সে ফরসা।

ওই মণিময়ই একদিন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রাসের মেলা দেখাতে। তখন বাড়ি থেকে বেরোতেই দিতো না বাবা-মা।

মা বলতো—না, খবরদার, বাড়ির বাইরে একলা-একলা কোথাও যাবে না।

মণিময় বলেছিল—তোর মা তো এখন ঘুমুচ্ছে রে, ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমরা চলে আসবো, কেউ টের পাবে না—

রাসের মেলা কি এখানে? কালিঘাটের রেলের পুলটা পেরিয়ে টালিগঞ্জে গেলে তবে রাসের মেলা দেখা যায়।

মা তখন ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজার খিলটা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল মণিময়দের বাড়িতে।

মণিময় জামা-কাপড় পরে রেডি হয়ে ছিল।

বললে—তোর মা টের পায়নি তো?

দুলাল বললে—না, তোর মা?

মণিময় বললে—আমার মা সিনেমা দেখতে গেছে—

পার্কের পাশেই সিনেমার বাড়িটা। মণিময়ের বাবা অফিস চলে

গেলেই মণিময়ের মা মণিময়কে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতো। বিশ্বাসী চাকর ছিল মণিময়দের।

মণিময় বলতো—আমি চোখ বুজলেই মা মনে করতো আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছি।

—তোর মা অত সিনেমা দেখে কেন রে?

মণিময় জিজ্ঞেস করতো—কেন, তোর মা সিনেমা দেখে না?

দুলাল বলতো—আমাদের তো চাকর নেই, মা কাজ করে মোটে সময় পায় না। আর বাবা বলে—সিনেমা দেখা খারাপ। ভালো-ভালো লোকেরা সিনেমা দেখে না।

মণিময় বলতো—আমার বাবা জানতেই পারে না যে মা অত সিনেমা দেখে—

—তোর বাবাও বুঝি সিনেমা দেখা পছন্দ করে না?

মণিময় বলতো—বাবা পছন্দ করে না বলেই তো মা লুকিয়ে-লুকিয়ে সিনেমা দেখে, বাবা আপিস থেকে ফেরবার আগেই মা বাড়িতে চলে আসে—

মণিময় আর দুলাল সেদিন সত্যিই মেলা দেখতে গিয়েছিল।

মণিময় বললে—দুর, দিনের বেলা এলে কিচ্ছু মজা হয় না। রাত্তির বেলাতেই যত মজা—

কত লোক মেলার ভেতর। কত পুতুল, কত পাঁপর-ভাজা। কত লোক, কত খেলনা। দেখতে দেখতে পা ব্যথা হয়ে গেল দুলালের। পয়সা নিয়ে গিয়েছিল মণিময়।

দুলাল বললে—আমার কাছে একটাও পয়সা নেই ভাই—

মণিময় বললে—আমার কাছে পয়সা আছে, দেখবি? এই দ্যাখ্—

দু'আনার আলুর-চপ আর দু'আনার পাঁপর-ভাজা। তাই খেতে খেতেই আবার বাড়ির দিকে এসেছিল দু'জনে। আসবার পথে একটা কাণ্ড হলো। গোবিন্দ আঢ্যি রোডে মণিময়দের বাড়ির

কাছাকাছি একটা লরি থেকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি নামানো হচ্ছিল। পাশেই একটা করাত-কলের কারখানা। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সেখানে চেরাই হয়।

মণিময় আর দুলাল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ···

হরিবিলাস অফিস যাবার পথে বড়রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। বেশ ভিড় চারদিকে। ভোর হতে না হতেই পাড়ার লোক জড়ো হয়েছে রাস্তায়।

ভিড়ের মধ্যেই হরিবিলাস ঠেলে-ঠুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

—হ্যাঁ মশাই, কে ফার্স্ট হচ্ছে? কত নম্বর?

কে একজন চিনতে পেরেছে হরিবিলাসকে। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—ও হরিবিলাসবাবু, ছেলেকে দেখতে এসেছেন?

হরিবিলাস চেনা লোক দেখে সেইদিকে এগিয়ে গেল।

—এই যে ভুবনবাবু, কী রেজাল্ট্ মশাই?

ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করলে—অফিস চললেন নাকি? এত সকালে?

—আর মশাই, রাতটুকু শুধু ঘুমোতে বাড়ি আসি, আর কী করবো, অফিসটা হয়েছে বড় পাজি—

ভুবনবাবু বললেন—বড় ইন্টারেস্টিং করেছে বিপিন সরকার—সবাই দৌড়চ্ছে—

—আমার ছেলেকে দেখেছেন নাকি? বারো নম্বর···

ভুবনবাবু বললেন—এখন ওই গোবিন্দ আঢ্যি রোডের দিকে আছে, আর একটু দাঁড়ান, এক্ষুনি এখান দিয়ে যাবে—

—কিন্তু আমার তো অতক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। ওদিকে এক-মিনিট লেট হয়ে গেলে নাম-কাটা যাবে—

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো হরিবিলাস। আরো অনেকেরই বাবা-ভাইরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই আশা তাদের ছেলে

ফার্স্ট হবে। জীবনে ফার্স্ট হতে না পারলে সব মিথ্যে। যেমন করে হোক সকলকে হারাতে হবে, সকলের মাথায় উঠতে হবে। আমরা জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়েছি, আমরা পরাজিত হয়েছি, আমাদের ছেলেরা যেন জেতে। আমাদের নাতিরা যেন ফার্স্ট হয়!

—বাক্ আপ্, বাক্ আপ্ বিজয়—

বিজয় এক নম্বর ছেলে। এক নম্বর-মার্কা ছেলেটাই তখন দৌড়তে দৌড়তে আসছে সেন্ট্রাল রোড়ে। বিরাট চওড়া সেন্ট্রাল রোড। সেই অত শীতের ভোরেও সকলের বাবা-দাদারাও হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—কী হলো মশাই? কতক্ষণ দৌড়চ্ছে এরা? ক' রাউণ্ড্ হলো?

হরিবিলাসের কথার উত্তর দেবার সময় নেই কারো। সবাই টেন্‌শনে ভুগছে তখন। সকলের ছেলেরই ফার্স্ট হওয়া চাই! সকলেই ফার্স্ট হবে। প্রাইজ পাবে। ছেলে প্রাইজ পেলেই বাপের প্রাইজ পাওয়া হলো। বাপ জীবনে ফার্স্ট হতে পারেনি। বাপের বয়েস হয়েছে, তবু বাপের নামও কেউ শোনেনি। না সংসারে, না পাড়ায়, না অফিসে। সেই ছোটবেলা থেকে অফিসে ঢুকেছে, প্রতি মুহূর্তে প্রতি মাসে, প্রতি বছরে ভেবেছে এইবার হয়তো দিন ফিরবে, এইবার হয়তো সকলকে টপকিয়ে সকলের মাথায় উঠবে।

কিন্তু এ-যাবৎ কিছুই হয়নি।

এতদিন বেঁচে থেকেও বাঁচার যন্ত্রণাই ভোগ করেছে শুধু, বাঁচার সুখের দিকটার স্বাদ পায়নি। এবার ছেলে বাপের মুখ রাখবে। এবার ছেলের সঙ্গে বাপও ফার্স্ট হবে।

—ওই চার নম্বর আসছে!

সবাই গুঞ্জন শুরু করলো। ওই আসছে চার নম্বর রানার!

চার নম্বর রানারের বাবা কে তা কে জানে!

একজন বললে—টুনু হলো চার নম্বর। নাম্বার ফোর। বাক্ আপ নাম্বার ফোর!

হরিবিলাসের মনে হলো নাম্বার ফোরের দিকেই যেন বেশি পক্ষপাতিত্ব। সবাই যেন চায় নাম্বার ফোর ফার্স্ট হোক! আশ্চর্য, এত লোক থাকতে নাম্বার ফোরের দিকে এত সাপোর্ট কেন?

—কে মশাই? নাম্বার ফোর কার ছেলে?

—জানেন না? কেষ্টবাবুর ছেলে।

—কেষ্টবাবু কে?

—সে কি, আমাদের বেকার রোডের ল্যাণ্ড্ রেজিস্ট্রার কে. সি. মজুমদারের ছেলে।

ও, এতক্ষণে মনে পড়লো। হরিবিলাসের কেমন যেন অবাক লাগলো। কে. সি. মজুমদার। দেড় হাজার টাকা মাইনের ক্লাস-ওয়ান গেজেটেড্ অফিসার মিস্টার কে. সি. মজুমদার, তারই ছেলের জন্যে সকলের এত আগ্রহ! আশ্চর্য, অত বড়লোক, বেকার রোডে অত বড় কোয়ার্টার। মস্ত একটা এ্যালসেসিয়ান কুকুর বাঁধা থাকে। বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেও ঘেউ-ঘেউ করে। তক্মা-পরা চাপরাশি-খানসামা-বয়-বাবুর্চি ঘিরে থাকে। সব সময় কেউ-না-কেউ কোনও আর্জি নিয়ে হুজুরের দরবারে হাজির। সেই লোকের ছেলে।

—আর কত সময় আছে মশাই?

অনেকবার জিজ্ঞেস করবার পর একজন একটু উত্তর দিলে।

বললে—এখনও অনেক সময় আছে। নাম্বার ইলেভেন হয়তো নাম্বার ফোর হয়ে যাবে, আবার নাম্বার ওয়ান হয়তো নাম্বার টেন হয়ে যাবে—এও তো মশাই ঘোড়-দৌড়ের মত ব্যাপার—

পাশ থেকে একজন নিরপেক্ষ লোক বললে—জীবনটাই ঘোড়-দৌড় মশাই—জীবনটাই ঘোড়-দৌড়—

হরিবিলাস লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে। নেহাত গো-বেচারা গোছের লোক। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ষাট-সত্তর বছর বয়েস। দেখলেই বোঝা যায় জীবনে অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে, কারণ অনেক ভুগেছে।

বড় ভালো লাগলো লোকটার কথাগুলো।

হরিবিলাস লোকটার দিকে একটু মিষ্টি হেসে চেয়ে দেখলে।

বললে—ঠিক বলেছেন মশাই আপনি, ঠিক বলেছেন, জীবনটা ঘোড়-দৌড়—

লোকটাও চাইলে হরিবিলাসের দিকে। কিন্তু কিছু কথা বললে না।

হরিবিলাস জিজ্ঞেস করলে—আপনার ছেলে-টেলে দৌড়চ্ছে বুঝি?

ভদ্রলোক বললে—না মশাই, আমি এমনি মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছিলাম, ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি—

—সত্যিই জীনটা ঘোড়-দৌড়, কী বলেন?

—কেন, আপনার সন্দেহ আছে নাকি? আপনি আগে কথাটা শোনেননি?

হরিবিলাস বললে—শুনেছিলুম, কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় শুনিনি কিনা, তাই ঠিক মানেটা বুঝতে পারিনি।

—আপনার ছেলে দৌড়চ্ছে নাকি?

হরিবিলাস বললে—হ্যাঁ—

—আপনি কী করেন?

হরিবিলাস বললে—এমনি সামান্য একটা চাকরি করি।

—মাইনে কম, না বেশি?

হরিবিলাস সঙ্কোচ করছিল উত্তর দিতে। কিন্তু সেটা কাটিয়ে নিয়ে বললে—এমনি সাধারণ চাকরি, বেশি পাবো কী করে?

—আহা, দিন আনেন দিন খান, তাই তো?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী?

অচেনা-অজানা ভদ্রলোক, কোনও দিন আলাপ-পরিচয় ছিল না। কিন্তু বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ভদ্রলোক বললে—জানেন, আপনার ছেলেকে আপনি যতই

খাওয়ান-পরান, যত মাস্টার রেখেই লেখাপড়া শেখান, যা-হবার তা হবেই, আপনি চেষ্টা করেও এড়াতে পারবেন না—

হরিবিলাস ভদ্রলোকের দিকে অবাক বিস্ময়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

বললে—আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না—আপনি কোন্ পাড়ায় থাকেন ?

ভদ্রলোক বললে—আমি থাকি নিউ-আলিপুরে। খবরের কাগজে খবরটা দেখে আজ এ-পাড়ার দিকে বেড়াতে এলুম। রোজ ফাঁকা মাঠের দিকে যাই, আজকে এই দৌড় দেখতে এসেছি। দেখতে এসেছি কে ফার্স্ট হয়।

হরিবিলাস বললে—আপনার আর ভাবনা কীসের ? আপনার ছেলে তো আর দৌড়চ্ছে না। আমার ছেলে যে এখন দৌড়চ্ছে। সুতরাং আমার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন—

ভদ্রলোক বললে—আমি সবই জানি মশাই, আমি সবই জানি—

হরিবিলাস অবাক হয়ে গেল।

বললে—আপনি কী করে জানলেন ?

ভদ্রলোক বললে—অনেক ফার্স্ট হওয়া তো দেখলুম, অনেক ফার্স্ট হওয়া লোকও দেখেছি—নিজেও ফার্স্ট হয়েছি—

—আপনি নিজেও ফার্স্ট হয়েছেন ?

ভদ্রলোক কী-রকম একটা নিস্তেজ হাসি হাসতে লাগলো। বললে—হ্যাঁ—

—অবাক করলেন তো আপনি ! কীসে ফার্স্ট হয়েছেন ?

ভদ্রলোক বললে—লেখাপড়ায়। আমি এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছি।

—সে কী ?

হরিবিলাস এবার ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়ালো। যেন তাজমহল দেখছে। সেই শীতের ভোরেও হরিবিলাস ঘামতে

লাগলো। ছেলেরা দৌড়চ্ছে, সেদিকে নজরও পড়লো না হরিবিলাসের।

হরিবিলাস বললে—আপনি এখানে কোথায় থাকেন বললেন ?

ভদ্রলোক বললে—নিউ-আলিপুরে—

—নিজে বাড়ি করেছেন বুঝি ?

—কী যে বলেন আপনি! পরের বাড়ির গলগ্রহ।

বলে ভদ্রলোক আবার হাসতে লাগলো।

হরিবিলাস বললে—গলগ্রহ মানে ?

ভদ্রলোক বললে—এক বন্ধুর বাড়িতে গলগ্রহ, মশাই। সে দয়া করে খেতে দেয়।

—তার মানে ? সে খুব বড়লোক নাকি ?

ভদ্রলোক বললে—দেখুন, এখন মর্নিং-ওয়াক্ করতে বেরিয়েছি, বেশি বলবার সময়ও নেই, শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, যার বাড়িতে আমি অন্নদাস সে ম্যাট্রিক-ফেল, আমাদের ক্লাশের লাস্ট বয় ছিল, এককালে সে আমাকে হিংসে করতো—

হরিবিলাস তাজ্জব হয়ে গেল।

বললে—আপনার তো মোটর চড়ে বেড়ানো উচিত মশাই—

—মোটরের কথা বলছেন, নিজের পায়ের একজোড়া জুতো কেনবার ক্ষমতাও আমার নেই, আমার বন্ধু দয়া করে পায়ের এই জুতো-জোড়া কিনে দিয়েছিল তাই পরছি। তাই জন্যেই তো বলছিলাম জীবনটাই ঘোড়-দৌড় মশাই, এই জীবনটাই একটা ঘোড়-দৌড়—

—বাক্ আপ্, বাক্ আপ্ নাম্বার এইট্—

হঠাৎ যেন হরিবিলাসের ধ্যান ভাঙলো।

হরিবিলাস চেয়ে দেখলে নাম্বার এইট্ ফার্স্ট হতে চলেছে। নাম্বার ফোর সেকেণ্ড—

—বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর, বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর—

চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো।

নাম্বার টুএলভ্ তখনও দৌড়চ্ছে।

দুলাল যেন সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই লড়াই করে চলেছে। কীসের লড়াই তা সে জানে না। দুলালের মনে হয় লড়াই না করলে এ পৃথিবীতে বোধহয় টেকা যায় না।

মণিময় বলতো—জানিস, আমার বাবা বলেছে যে পরিশ্রম করে সে-ই জেতে। আমি তাই রাত জেগে জেগে পড়ি—

—রাত জেগে পড়তে তোর কষ্ট হয় না?

মণিময় বলতো—খুব কষ্ট হয়, আমি ঘুম পেলেই চোখে সরষের তেল লাগিয়ে দিই, তখন আর ঘুম পায় না—

—যদি তেল লেগে চোখ অন্ধ হয়ে যায়?

মণিময় বলতো—দূর, তেল লাগলে কখনও চোখ অন্ধ হয়? আকন্দর আঠা লাগলেই অন্ধ হয়—

ছোটবেলাকার ঘটনা সব। একেবারে যখন নিচের ক্লাশে পড়তো দুলাল, সেই সময়কার ঘটনা। ওই মণিময়ই ক্লাশে তখন ফার্স্ট হতো। সব সাবজেক্টে ফার্স্ট। অঙ্কে একশো নম্বর পেতো।

দুলাল অনেকবার মণিময়দের বাড়িতে গিয়ে তার কাছ থেকে অঙ্ক বুঝে নিয়ে এসেছে। বড় বড় বুদ্ধির অঙ্কগুলো এক-মিনিটে করে দিতো মণিময়। অঙ্কতেই ছিল তার বেশি মাথা। একটু মাথা ধরলেই অঙ্ক কষতে বসতো। সংস্কৃত পরীক্ষার দিনও অঙ্ক কষতো।

বলতো—অঙ্কটা একটা ওষুধ—

মণিময়ের বাবাকে দেখলে ভয় হতো দুলালের। ভারি গম্ভীর মানুষ। ছেলের সঙ্গে কে আড্ডা দিচ্ছে, কে ছেলের সঙ্গে মিশছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতো। যখন সন্ধ্যেবেলা এক-একদিন মণিময়দের বাড়িতেযেতো তখন বাইরের ঘরে মণিময়ের বাবা সামনে বসে থাকতো।

দুলাল গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করতো—মণিময় আছে?

—কে তুমি?

তারপরেই বোধহয় মনে পড়ে যেতো।

—ও, তুমি হরিবিলাসবাবুর ছেলে ? যাও, ভেতরে যাও—

হরিবিলাসবাবুর ছেলে হলে যেন সাত-খুন মাপ। হরিবিলাসবাবুর ছেলে তার মণিময়কে খারাপ করতে পারবে না কিছু।

প্রথম প্রথম অবশ্য তেমন সুনজরে দেখতো না কেউ দুলালকে। কে দুলাল, কার ছেলে, কোথায় বাড়ি, কীরকম বংশ এ-সব প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু মণিময়ের কথায় সে-সব প্রশ্ন ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। গরীব বাপের ছেলে, বাড়িতে মাস্টার রাখবার ক্ষমতা নেই, তাই মণিময়ের কাছে পড়া জেনে নিতে আসে। তারপর থেকে আর কোনও কথা ওঠেনি দুলালকে নিয়ে।

ওদিকে বাড়িতে হরিবিলাসও বেশি কিছু বলেনি।

শুধু বলতো—নিজের ভবিষ্যৎ তোমার নিজের হাতে বাবা, নিজের যাতে ভাল হয় তাই-ই করবে, আমার আর আপত্তি কিসের ?

এক-একদিন জিজ্ঞেস করতো বাবা—ভাল পড়াশোনা হচ্ছে তো ?

এর বেশি আর কিছু নয়। মা-ও বুঝিয়ে বলতো—আমরা তো মণিময়দের মত বড়লোক নয়, ওদের সঙ্গে খুব সাবধানে মিশবে তুমি।

দুলাল বলতো—কিন্তু আমি তো ওদের বাড়িতে গিয়ে শুধু অঙ্ক শিখি—

—হ্যাঁ, অঙ্কটা শিখে নেবে, আর কিছু করবে না। কোনও জিনিস যেন ওদের কাছে চেও না। ওরা বড়লোক তো, খুব বড়লোক, ওদের কোনও জিনিসের ওপর যেন তুমি লোভ কোর না—

—আমি ওর কাছে কিছু চাই না মা।

—না, চেও না। যদি কিছু খেতে দেয় তো খেও না যেন!

দুলাল বলতো—মণিময় আমাকে কিন্তু খেতে বলে মা। একদিন খেয়েছিলাম—

—কী খেয়েছিলে ?

—রসগোল্লা। ওর জন্যে ওদের চাকর রসগোল্লা এনেছিল, ও আমার জন্যেও দুটো রসগোল্লা আনতে বললে—

—কিন্তু কেন খেলে ? উনি শুনলে কিন্তু রাগ করবেন।

—আমি তো খেতে চাইনি মা, ও যে জোর করে খাইয়ে দিলে!

মা বললে—তা খেয়েছো বেশ করেছো, আর কখ্খনো যেন খেও না, তখন ওরা ভাববে খাবার জন্যেই তুমি ওদের বাড়ি যাও বুঝি—

তা আর কখনও কিছু খায়নি দুলাল ওদের বাড়িতে। মণিময় হাজার বললেও খায়নি। সেই বাড়িটার সামনে দৌড়তে দৌড়তে সেই কথাই মনে পড়ছিল। এই বাড়িটা। এই বাড়িটাতেই দুলাল ছোটবেলায় কত বার এসেছিল আগে। সামনের বৈঠকখানা পেরিয়েই ছিল মণিময়ের পড়বার ঘর। ওই ঘরেই মণিময়ের মাস্টার-মশাই পড়াতেন মণিময়কে।

আর তারপর···?

মণিময়ের চেহারাটা যেন স্পষ্ট ভেসে উঠলো চোখের সামনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলে সামনের দোতলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে দেখছে।

বলছে—তুই দৌড়োচ্ছিস ? দৌড়ো, দৌড়ে আয় আমার কাছে, আমি তোর আগেই দৌড়তে দৌড়তে এখানে এসেছি—

দুলাল চোখ দুটো দুই হাতে রগড়ে নিলে। চোখ দুটো যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল।

হঠাৎ একটা শব্দে যেন চমকে উঠলো—বাক্ আপ্, বাক্, আপ্ নাম্বার টুয়েলভ্—

মনে হলো যেন বাবার গলা। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাকে উৎসাহ দিচ্ছে না। শুধু বাবা একলা তাকে 'বাক্-আপ' করছে···

বাবাকে খোঁজবার জন্যে দুলাল চেয়ে দেখলে ভিড়ের দিকে।

হরিবিলাসের এক হাতে টিফিনের কৌটো। আর এক হাতে একটা থলি।

হাঁ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে দুলালের দিকে চেয়ে দেখছিল। দুলাল

চোখ ফেরাতেই হরিবিলাস হাত দুটো উঁচু করে দোলাতে লাগলো—দৌড়ো, দৌড়ো, আরো জোরে, আরো জোরে—

দুলাল বাবার কথায় আবার সোজা দৌড়তে শুরু করলো। ফুসফুসে আরো দম টেনে নিলে, তারপর আরো জোরে পা ছোটাতে লাগলো।

কিন্তু গোবিন্দ আঢ্যি রোডের মোড়ের কাছে আসতেই আবার সেই কথাটা মনে পড়লো। সেই মণিময়ের কথা।

মণিময় তখন রাসের মেলা থেকে একটা বাঁশি কিনে নিয়েছে। কিনে দুলালকে দিয়েছে।

তখন মণিময়ের মনে মনে ভয়ও হয়েছে। যদি মা সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখে মণিময় বাড়িতে নেই, তাহলেই বাবাকে বলে দেবে রাত্রে। বাবা কোর্ট থেকে ফিরলেই বলবে—মণিময় কোথায় গিয়েছিল!

দুলাল বললে—তাহলে তুই এত দেরি করলি কেন?

মণিময় বললে—মেলা দেখতে দেখতে আর খেয়াল ছিল না ভাই—

—তাহলে চল, শিগগির-শিগগির পা চালিয়ে চল—

দুলাল আর মণিময় তখন টালিগঞ্জের রেলের পুলের তলা দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে আসছে। একটা রেল তখন কালিঘাট স্টেশনের দিকে আসছে। গুম্-গুম্ আওয়াজ হচ্ছে চারদিকে। একগাদা লোক গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

মণিময় বললে—ওরা সব বেলেঘাটার দিকে চলেছে—

—তা চলুক, তুই আর ওদিকে দেখিসনি। ওই দ্যাখ রাস্তায় জল দিচ্ছে, বেলা হয়ে গেছে—

মণিময় বড় রেলগাড়ি দেখতে ভালোবাসতো। রেলগাড়ি দেখতে অনেকদিন দুলালকে নিয়ে গেছে সে।

শেষকালে যখন গোবিন্দ আঢ্যি রোডের মোড়ে এসে পৌঁছেছে তখন দুর্ঘটনাটা ঘটলো। একটা বিরাট লরি থেকে কাঠের গুঁড়ি

নামানো হচ্ছিল করাত-কলের জন্যে। মণিময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

হঠাৎ হলো কি—একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি লরির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে আর পড়লো একেবারে মণিময়ের মাথায়।

মণিময় একবার চিৎকার করে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

দুলাল তখন পাশে দাঁড়িয়ে। এক নিমেষে যেন সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে উল্টে গেল। আর চারদিকে যে অত গোলমাল, হৈ-চৈ চিৎকার উঠেছিল, তার কিছুই কানে গেল না। সে যে কী কাণ্ড, তা আজ এতদিন পরে ভাবলেও দুলালের যেন বুকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

মনে আছে, সেদিন রাত্রে আর এক মিনিটের জন্যেও ঘুম আসেনি দুলালের।

চোখের সামনে কেবল মণিময়ের সেই রক্ত-মাখা চেহারাটার কথা ভেসে উঠেছিল। এক মিনিট আগেও যার সঙ্গে কথা বলেছে, যার সঙ্গে সারাদিন রাসের মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই মণিময়ই যে নেই, এ-কথা কল্পনা করতেও যেন বাধছিল দুলালের।

পুলিস এসে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

শুধু দুলালকেই জিজ্ঞেস করেনি, করাত-কলের মালিককেও জিজ্ঞেস করেছিল, লরীর ড্রাইভারকেও জিজ্ঞেস করেছিল।

সকলেরই এক কথা!

সকলেই বলেছিল—মণিময় লরীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল নামানো দেখছিল—

—সেখানে আর কে ছিল?

—আর একজন ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

—কে সে?

লরী-ড্রাইভার দুলালের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। সত্যিই দুলালও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা হাফ-প্যান্ট্ আর শার্ট পরা

কালো মতন ছেলে মণিময়ের সঙ্গে ছিল সেখানে। দেখে মনে হয় দু'জনেই পাড়ার ছেলে, বিকেলবেলা বাড়ি থেকে খেলা করতে রাস্তায় বেরিয়েছিল।

পুলিস দুলালকেও জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি মণিময়কে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে, না মণিময় তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল ?

দুলাল বলেছিল—আমরা দু'জনেই ঠিক করেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে রাস দেখতে যাবো—

—তারপর ?

পুলিসের দারোগার চেহারাটা বড় ভীষণ, দেখলেই ভয় করে এমন চেহারা।

দুলালের গলা কাঁপছিল, হাত কাঁপছিল, পা কাঁপছিল। বাবা সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিল। বাবা পাশে থাকা সত্ত্বেও খুব ভয় হচ্ছিল দুলালের।

বাবা অভয় দিলে। বললে—কিচ্ছু ভয় পাবার দরকার নেই তোমার, যা-যা ঘটেছিল, সব বলে যাও। তোমরা দু'জনেই রাসের মেলা দেখতে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ—

—আর তুমিই মণিময়কে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে ?

দুলাল বললে—হ্যাঁ, মণিময় আমাকে বলেছিল ওর মা দুপুরে সিনেমা যাবে। তখন বেরোলে কেউ জানতে পারবে না, আমরা লুকিয়ে বেরোব—সেই জন্যেই আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে চুপি চুপি ওকে ডেকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—

দুলাল যা বললে সব লিখে নিলে দারোগা।

এ সেই গোবিন্দ আঢ্যি রোড। সেই গোবিন্দ আঢ্যি রোড দিয়ে আজকে সবাই ছুটে চলেছে। চার-মাইল রেস। তবু দুলালের মনে হলো যেন অনেক দূর। যেন চার-মাইল দৌড়তে তার বুকের দম আটকে আসছে।

তারপর কত দিন কেটে গেছে। সে সেই ছোটবেলার কথা। ছোটবেলার অনেক কথা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখনও তো দুলাল ছোটই। বাবা তাকে এখনও ছোট বলেই ভাবে। মা-ও তাই মনে করে।

কিন্তু দুলালের মনে হয় সে অনেক বড় হয়েছে।

যখন 'মহাবীর সঙ্ঘে' দৌড়ের জন্যে নাম দিয়েছিল তখন মা শুনে বড় ভয় পেয়েছিল।

মা বলেছিল—না বাবা, তুমি গরীবের ছেলে, তুমি চার মাইল দৌড়তে পারবে কেন? শেষকালে ফুসফুসে ব্যথা হবে। তোমার স্বাস্থ্য তো ভাল নয়—

মা তো জানে না, তাকে ফার্স্ট হতেই হবে। ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা পর্যন্ত দুলালকে আমল দেয় না, বাবা-মাও দেয় না। লেখাপড়াতেও দুলাল ফার্স্ট হতে পারে না। কেউ কোথাও তাকে মানুষ বলে মনে করে না। তারও যে একটা অস্তিত্ব বলে জিনিস আছে, সে-ও যে মানুষ সেটা প্রমাণ করতে হবে। তাকে দেখাতে হবে সে-ও মানুষ। যাকে সবাই অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে, সবাই ছেলেমানুষ বলে তাচ্ছিল্য করে, সে যে আসলে তা নয়, তা সকলের সঙ্গে দৌড়ে প্রমাণ করে দিতে হবে।

দুলাল দমটা আটকে বুকটা চিতিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলো। গোবিন্দ আঢ্যি রোড, পেরিয়েই পিয়ারী মোহন রায় রোড, তারপর সেন্ট্রাল রোড। সেন্ট্রাল রোডটা ঘুরে আবার শঙ্কর বোস রোড, আবার শঙ্কর বোস রোড থেকে গোবিন্দ আঢ্যি রোড—

—বাক্ আপ্, বাক্ আপ্ নাম্বার এইট্—

চিৎকারটা কানে এল দুলালের, দু'পাশের বাড়ির বারান্দায় অনেক লোক ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা আল্‌সে চোখে দেখছে রাস্তার দিকে চেয়ে। আসলে মজাই দেখছে, মজা দেখতেই বেরিয়েছে সবাই রাস্তায়।

দুলালের নম্বর বারো। সকলের শেষ নম্বর। নাম্বার টুয়েল্‌ভ্‌। কেন যে শেষ নম্বরটাই তার ওপর দেগে দিলে কে জানে। সে তো ফার্স্ট হতেই চায়! সে তো বাবাকে দেখাতে চায় সে-ও জীবনে সকলকে ছাপিয়ে ওপরে উঠতে পারে, লেখাপড়ায় না পারুক, দৌড়ে অন্ততঃ ফার্স্ট হবে।

ফার্স্ট হলেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তাকে একটা সোনার মেডেল দেবে। প্রেসিডেন্ট ভাগবত হালদার। সেদিন মীটিং হবে ক্লাবের মাঠে। প্রেসিডেন্ট নাম ডাকবে—দুলাল সরকার—দুলাল সরকার—

ক্লাবের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দুলাল একেবারে ডায়াসের ওপর গিয়ে দাঁড়াবে। সবাই দেখবে তাকে। তার বাবা দেখবে। বাবার বন্ধু পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় দেখবেন। ইস্কুলের যদুবাবু দেখবেন।

হরিবিলাস অনেকবার ছেলেকে বলেছে—বেশ মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে বাবা—

কথাটা শুনে শুনে কান পচে গেছে দুলালের। যেন মন দিয়ে লেখা-পড়া করলেই জীবনে ফার্স্ট হওয়া যায়। জীবনে ফার্স্ট হওয়ার অনেক পথ আছে। লেখাপড়ায় যদি ফার্স্ট না-ও হতে পারো তো নেচে ফার্স্ট হও, গান গেয়ে ফার্স্ট হও। সবাই কি লেখাপড়াতে ফার্স্ট হতে পারে? ফুটবল খেলা রয়েছে, পাহাড়ে ওঠা রয়েছে, সাঁতার কাটা রয়েছে। পৃথিবীতে অনেক পথ খোলা রয়েছে সকলের জন্যে। আর ফার্স্ট ই যদি হতে না পারলুম তো মণিময়ের মত সেদিন কাঠের গুঁড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেই পারতুম!

বাবা যখন রান্নাঘরে খেতে বসে মা'র সঙ্গে গল্প করে তখন দুলাল অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শোনে।

বাবা বলতো—জানো, আজকে পঙ্কজ চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা হলো—

মা বলতো—পঙ্কজ চাটুজ্যে আবার কে?

বাবা বলতো—ওই যে আমাদের সঙ্গে পড়তো, লেখাপড়া কিচ্ছু

জানতো না, সিমেণ্ট আর লোহার কারবার করে লাখপতি হয়ে গেছে, সে দেখি না হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে—ডাক্তার বলেছে গাড়ি চড়লেই ব্লাডপ্রেসার বাড়বে—

লেখাপড়া না-শিখে পঙ্কজ চাটুজ্যে লাখপতি হয়েছে, আর বাবা ?

বাবা বলতো—অথচ সারা জীবন মন দিয়ে লেখাপড়াই তো করে এসেছি, ফার্স্ট হতে পারি আর না-পারি, অন্য কোনও দিকে তো মন দিইনি—

মা বলতো—তা'হলে তুলালকে তুমি অত লেখাপড়া করতে বলো কেন ?

বাবা বলতো—বলি কি আর সাধে, বলি এই জন্যে যে লেখা-পড়াটা শিখলে তবু কিছু করতে না পারুক, সৎপথে থাকবে—সৎপথে থাকার অনেক লাভ—

—কিন্তু সৎপথে থেকে যদি খেতে না পায় ?

বাবা বলতো—তা তো নিজেই দেখতে পাচ্ছি, লেখাপড়া শিখে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে লাভ কী হলোটা আমার ? একটা বাড়িওকরতে পারলাম না। বাড়ি করা দূরে থাক, একটা বাসন-মাজার ঝি-চাকরও রাখতে পারলাম না—

রান্নাঘর থেকে কথাটা তুলালের কানে আসতো।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাবা জিজ্ঞেস করতো—তুলাল কী করছে ? পড়ছে ?

মা বলতো—এই তো দেখে এলুম শুয়ে আছে, এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে—

সে-সব কথা আজও মনে আছে তুলালের। এই শীতের সকালে দৌড়তে দৌড়তে আবার সেই কথাগুলোই মনে পড়লো। তাকে যেমন করে হোক বড় হতে হবে। স্কুলে লেখাপড়ায় বড় হবার উপায় নেই। সেখানে কোচিং স্কুলের স্টুডেণ্ট না হলে কিছুতেই ফার্স্ট হওয়ার উপায় নেই। কী করে যে তারা আগের থেকে

কোশ্চেন জানতে পারে কে জানে ?

যতুবাবুর নিজেরই কোচিং স্কুল আছে। যতুবাবু অনেকবার তুলালকে বলেছেন—এ্যাই, তোর বাবাকে বলবি যেন আমার কোচিং-ক্লাশে ভর্তি করে দেয়, বুঝলি ?

বাবাকে বললেই বাবা রেগে যেতো।

বলতো—কেন, কোচিং-ক্লাশে কেন ? ইস্কুলে পড়তে কী হয়েছে ? ইস্কুলে ভালো করে পড়ায় না কেন মাস্টাররা।

কোচিং-ক্লাশের ওপর বাবার বরাবর ভীষণ রাগ। অফিসে সারা দিন খাটুনির পর আবার বাড়িতে এসেও তুলালকে পড়াতে বসবে।

বলবে—আমি পড়াচ্ছি তোমাকে, আমি তোমাদের ইস্কুলের মাস্টারদের চেয়েও ভাল করে পড়িয়ে দেবো। দাও, কী পড়া আছে, আমাকে দাও—

কিন্তু হাজার পড়েও কখনও তুলাল ক্লাশে ফার্স্ট হতে পারেনি। ফার্স্টও হতে পারেনি, সেকেণ্ড থার্ড কিছুই হতে পারেনি। ক্লাশের ছেলেদের সামনে কোনও দিনই কোনও সম্মান পায়নি তুলাল। সে বরাবর লাস্ট হয়ে এসেছে।

কিন্তু আজ ?

মহাবীর সঙ্গের চার মাইল রেসে আজ তুলাল নাম দিয়েছে। আজ সে ফার্স্ট হবেই।

ফার্স্ট হলে একটা ভাল প্রাইজ দেবে প্রেসিডেন্ট ভাগবত হালদার। সেক্রেটারি বিপিনদা সকলকে ডেকে বলে দিয়েছে—সোনার মেডেল দেওয়া হবে ফার্স্ট বয়কে—

সেকেণ্ড প্রাইজও আছে, থার্ড প্রাইজও আছে। থার্ডের নিচেও হয়তো প্রাইজ আছে, কিন্তু থার্ড প্রাইজের নিচের প্রাইজের কোনও সম্মান নেই। সম্মানটাই তো আসল। ফার্স্ট প্রাইজ পেলে সকলের সামনেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে তুলাল।

বাবার বন্ধু পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় থাকবে, মণিময়ের বাবাও হয়তো থাকবে মীটিং-এ। যতুবাবুও হয়তো থাকবেন। যতুবাবুরা দেখবেন—ত্নলাল মেডেল নিচ্ছে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে। বাবাও দেখবে। বাবার বুকটা দশ হাত ফুলে উঠবে—

—ওই নাম্বার সিক্স্ আসছে। বাক্ আপ্ নাম্বার সিক্স—

ত্নলাল বুঝতে পারলে পেছন থেকে নাম্বার সিক্স আসছে তাকে হারাতে। ত্নলাল আরো জোরে পা বাড়ালো···

হরিবিলাসের বুকটা তখন থর থর করে কাঁপছে। কই, ত্নলাল কোথায়? ত্নলাল কি পেছিয়ে রইলো নাকি? কোথাও পড়ে-টড়ে গেল?

ওদিক থেকে শঙ্কর বোস রোডের মোড়টা ঘুরেই হঠাৎ নাম্বার ফোর সামনে এসে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে হাততালি।

—বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর। বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর—

চারদিক থেকে সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। আশ্চর্য, সবাই নাম্বার ফোরকে এত উৎসাহ দিচ্ছে কেন?

একজন পাশ থেকে বললে—নাম্বার ফোরই এদের সকলের মধ্যে একটু স্টেডি—

হরিবিলাস ভিড় থেকে মাথা উঁচু করে ভাল করে দেখলে নাম্বার ফোরকে। ত্নলালেরই মত বয়েস। কিন্তু ফরসা গায়ের রং। গায়ে একটা স্পোর্টস্ গেঞ্জি, পায়ে কেট্স্, হাঁটু পর্যন্ত ফুল-মোজা।

হরিবিলাস নিজের মনেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ত্নলালকে কিছুই কিনে দিতে পারেনি হরিবিলাস।

পাশের সেই নিউ আলিপুরের ভদ্রলোক তখনও মৃত্নু মৃত্নু হাসছিল।

বললে—আপনার ছেলেও আছে নাকি দলে?

হরিবিলাস বললে—আছে—

—কত নম্বর ?

হরিবিলাস বললে—বারো—

ভদ্রলোক বললে—ভালো—থাকা ভালো—

—থাকা ভালো মানে ?

হরিবিলাস ঠিক বুঝতে পারলে না ভদ্রলোকের কথাটা।

ভদ্রলোক বললে—ফার্স্ট হোক আর লাস্ট হোক, দৌড়ানোটা ভালো—

হরিবিলাস বললে—দেখুন, সারাজীবন নিজের তো কিছু হয়নি। সেই মার্চেন্ট-অফিসে এতকাল ধরে ঘষছি। যেটুকু সময় পাই ছেলেকেই দেখি। আমার ছেলেটা খুব ভালো মশাই। নিজের ছেলে বলে বলছি না, অমন ছেলে হয় না—

ভদ্রলোক বললে—দেখুন, আমার বাবাও বলতো আমার মত ছেলে হয় না। আমার স্কুলের টিচাররাও তাই বলতো, আমার কলেজের প্রফেসাররাও তাই বলতো—বাপেরা নিজের ছেলেদের ভালো তো বলবেই—

হরিবিলাস ভদ্রলোকের কথায় কেমন যেন লজ্জায় পড়লো।

বললে—আমি ঠিক তা বলছি না, নিজের ছেলে বলে বলছি না। পাড়ার যে-কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন—

ভদ্রলোক বললে—আমিই কি খারাপ ছেলে ছিলুম মশাই ? ভালো-খারাপের মানদণ্ডটা কী বলুন তো ?

হরিবিলাস এ-কথার উত্তর দিতে পারলে না। কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগলো। ভদ্রলোককে কেমন যেন অহঙ্কারী মনে হলো ! এত অহঙ্কার কি ভালো ? জীবনে কিছু হতে-না-পারারও একটা অহঙ্কার থাকে। ভদ্রলোকের বোধহয় তাই-ই হয়েছে।

—রাগ করলেন নাকি ? রাগ করবেন না। ওই তো আপনাকে গোড়াতেই বলেছিলুম, জীবনটাই ঘোড়-দৌড়। যে জিততে পারবে,

তারই জয়-জয়কার। ভালো-খারাপের কথা ভুলে যান। ওটা কথার কথা। ওটা ডিক্সনারিতে লেখা আছে, লেখা থাক। জীবন তো আর ডিক্সনারি নয়—

সত্যিই ততক্ষণে নাম্বার ফোর সকলকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নাম্বার ফোর। টুলু। নামটা পর্যন্ত সবাই জানে। সবাই যেন মনে মনে চাইছে টুলুই ফার্স্ট হোক। অথচ টুলু কারো আত্মীয় নয়। টুলু কারো বন্ধু নয়। কেন ওরা টুলুর ফার্স্ট হওয়া চাইছে? টুলুর ফার্স্ট হওয়ার সঙ্গে ওদের কীসের স্বার্থ জড়িত? ওরা সবাই কেন টুলুকে ফার্স্ট দেখতে চায়? কেন চায় না নাম্বার টুয়েল্‌ভ্ ফার্স্ট হোক। নাম্বার টুয়েল্‌ভ্ ওদের কী ক্ষতি করলো?

হরিবিলাস যে নাম্বার টুয়েল্‌ভের বাবা এটা প্রকাশ করতেও লজ্জা হলো।

ছেলে হেরে গেলে বাবার লজ্জা কেন হবে? ছেলের পরাজয়ের সঙ্গে কি বাপের পরাজয়ও জড়িয়ে আছে!

অথচ যে জিতছে সেই নাম্বার ফোরের বাবা তো আসেনি। নিশ্চয়ই আসেনি। ল্যাণ্ড রেজিস্ট্রারের ছেলে দৌড়চ্ছে বলেই যে ল্যাণ্ড্ রেজিস্ট্রার নিজে আসবে তার কী মানে আছে!

কেষ্ট মজুমদার। মিস্টার কে. সি. মজুমদার তিনি।

বেকার রোড দিয়ে অফিস যাবার সময় অনেকবার দেখেছে হরিবিলাস। বাড়ির সামনে সকাল বেলাই অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।

এক-একজন লোক এক-এক কাজে আসে তাঁর কাছে।

বিরাট চাকরি। চাকরি যেমন তাঁর বিরাট, লোকটিও তেমনি রাশভারি। মাইনে নিশ্চয়ই বেশি পান তিনি। বেশি তো বটেই, অনেক বেশি। হরিবিলাসের চেয়েও বেশি। অনেক অনেক বেশি। গাড়ি করে অফিসে যান। অফিসে গিয়েও তাঁর নিজের অনেক চাপরাশি আছে। হরিবিলাসের মত সরযূপ্রসাদের দোকানে গিয়ে

তেল-নুন কিনতে হয় না। কয়লার দোকানে গিয়ে কয়লার জন্যেও দরবার করতে হয় না।

সরযূপ্রসাদ যেমন ফার্স্ট হয়েছে, পঙ্কজ চাটুজ্যে যেমন ফার্স্ট হয়েছে, কে. সি. মজুমদারও তেমন ফার্স্ট হয়েছেন।

মিঃ মজুমদারের কখনও বেশি সময় থাকে না। বলেন—আপনার কী দরকার আছে বলুন, আমার বেশি সময় নেই—

লোকে বলে—কী চমৎকার মানুষ মজুমদার সাহেব, কত কাজের মধ্যেও মন দিয়ে সব কথা শুনলেন কিন্তু—

মিঃ মজুমদার বলেন—দেখুন, আমি নিজে যেমন অন্যায় করবো না, অন্যায় কেউ করুক তাও আমি সহ্য করবো না—

এক-একজন লোক আগে ওঁর অফিসে কত হাঁটাহাঁটি করেও সুরাহা করতে পারেনি। গ্রামের অশিক্ষিত লোক সব। একে ঘুষ দিতো, ওকে ঘুষ দিতো, কেউ টাকা ছাড়া কথাই বলতো না কারো সঙ্গে। আলিপুর কোর্টে আসতে হলে কোঁচড়ে এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে আসতে হতো।

আর শুধু কি তাই?

মেয়েরা পর্যন্ত আসতো তাঁর কাছে। কত লোকের কত সম্পত্তি, কত লোকের কত সম্পত্তির কত ভাগীদার। জমি-জমা সম্বন্ধে যে নতুন আইন হয়েছে তা অনেকে জানে না। ভাইদের সঙ্গে বোনেদেরও ভাগ পাওয়ার নিয়ম হয়েছে।

মিঃ মজুমদার বলেন—আমি যতদিন আছি ততদিন কোনও ভাবনা নেই আপনাদের, আপনাদের এক পয়সা ঘুষ দিতে হবে না কাউকে—

সত্যিই, মিঃ মজুমদার এ-অফিসে আসবার আগে পর্যন্ত ঘুষের কারবার চলতো বেপরোয়া ভাবে। কিন্তু তিনি আসার পর থেকে সমস্ত বন্ধ হয়েছে।

হরিবিলাস শুনেছিল টুলুর কথা—

দুলালই বলেছিল বাবাকে। দুলাল বলেছিল—আমাদের ইস্কুলে

মজুমদার সাহেবের ছেলে এসে ভর্তি হয়েছে বাবা।

হরিবিলাস জিজ্ঞেস করেছিল—সে-ই বুঝি এবার ফার্স্ট হয়েছে?

ক্লাশেও ফার্স্ট টুলু, এবার দৌড়েও সে ফার্স্ট হবে হয়তো। যাদের ভাল হয়, তাদের বোধহয় সব কিছুই ভাল হয়। যখন ভাল সময় আসে তখন বাড়িতে ভাল ঝি-চাকরও পাওয়া যায়।

কল্যাণী বলতো—ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না—দেখ, ভগবান মাথার ওপর আছেন, তিনি যদি মুখ তুলে চান তা'হলে আমাদেরও একদিন ভাল হবে। আমরা তো কারোর মন্দ করিনি—

হরিবিলাস বলতো—ভগবান যে কী চান তা যদি জানতে পারতুম—

ভগবানের চাওয়াটা জানতে পারলে হরিবিলাস কী যে করতো তা আর মুখ ফুটে বলতো না।

পাশের ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর ছেলেদের দৌড় দেখছে একমনে।

বললে—ওই দেখুন আপনার ছেলে আসছে। আপনার ছেলেই তো নাম্বার টুয়েল্‌ভ্—

হ্যাঁ, দুলাল আসছে। যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যেন একটু খোঁড়াচ্ছে। বুকটা দুর-দুর করে কেঁপে উঠলো হরিবিলাসের। দুলাল কি পড়ে যাবে নাকি? দুলাল কি হাঁপিয়ে উঠেছে। সব লোকগুলো চুপ করে আছে। কেউ কিছু বলছে না। সবাই বুঝতে পেরেছে নাম্বার টুয়েল্‌ভের কোনও চান্স নেই।

—আপনি তো অফিসে যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন, অফিসে গেলেন না?

হরিবিলাস অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ছেলেদের দেখে। হঠাৎ ভদ্রলোকের কথায় যেন চমকে উঠলো।

বললে—আমাকে বলছেন?

ভদ্রলোক বললে—আপনি অফিসে গেলেন না?

হরিবিলাস বললে—অফিসে যাবো বলেই তো বেরিয়ে ছিলুম, ভেবেছিলুম যাবার পথে একটুখানি দেখেই চলে যাবো, আমার আবার সকাল আটটায় অফিস, আর সেই বিকেল চারটেয় ছুটি।

—তা গেলেন না কেন?

হরিবিলাস বললে—কী করে যাই বলুন, দেখছেন তো আমার ছেলে কী রকম হাঁফাচ্ছে—

—তাতে আপনার কী? যে জিতবে সে আপনি থাকলেও জিতবে, আপনি না-থাকলেও জিতবে। আর যদি হারে তো আপনি থাকলেও হারবে, না-থাকলেও হারবে।

—কিন্তু সেই অশান্তি নিয়ে কি অফিসে যাওয়া যায়?

ভদ্রলোক বললে—এই তো সবে শুরু হলো মশাই—

—শুরু হলো মানে?

হরিবিলাস যেন ঠিক বুঝতে পারলে না।

ভদ্রলোক বললে—ওই দেখছেন না, নাম্বার ফোর তো দৌড়চ্ছে, শুনছি ও নাকি ল্যাণ্ড্ রেজিস্ট্রার মিঃ মজুমদারের ছেলে। কই, মিঃ মজুমদার তো আপনার মত এখানে আসেননি—

হরিবিলাস বললে—তিনি কী করে আসবেন বলুন, তাঁর কত কাজ, কত লোক তাঁর বাড়িতে গিয়ে ধর্না দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসলো। বললে—তার মানে তিনিও দৌড়চ্ছেন—

হরিবিলাস বললে—তা যদি বলেন তা'হলে আমরা তো সবাই দৌড়চ্ছি মশাই, আমি তো এখনও উদয়াস্ত খেটে চলেছি, দু'হাতে সংসার করে চলেছি।

—আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

হরিবিলাস বললে—আমার ওই এক ছেলে মশাই, ওই একটি বলেই তো এত ভাবনা···

—ওই তো ভুল করছেন। ভাবনা আপনার ছেলের জন্যে নয়, ভাবনা আপনার নিজের জন্যেই। ছেলেকে উপলক্ষ্য করে আপনি

নিজেকে নিয়েই ভাবছেন।

হরিবিলাস বুঝতে পারলে না কথাটা।

বললে—তার মানে?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, আপনি নিজেকে নিয়েই ভাবছেন। অত ভাববেন না, ভেবে কোনও লাভ নেই, আলেয়ার পেছনে দৌড়ে কোনও ফয়দা নেই।

—আলেয়া কেন বলছেন? ফার্স্ট হতে চাওয়াটা কি আলেয়া?

ভদ্রলোক বললে—একটু ভালো করে তলিয়ে দেখবেন। ও আলেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই আমাকেই দেখুন না। আমি তো ফার্স্ট হয়েছিলুম, এম.-এ. ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট। তাতে হলোটা কী? এখন একজোড়া জুতো কেনবার পয়সাও উপার্জন করতে পারি না—

হরিবিলাস বললে—সে তো আপনার নিজের ইচ্ছে। আপনার নিজের ইচ্ছে হয়নি উন্নতি করতে—

ভদ্রলোক বললে—ইচ্ছে আমি করেছিলুম মশাই, কিন্তু হেরে গিয়েছি—

—কী করে?

—আমার টি. বি. হয়েছিল। আই. এ. এস. একজামিন দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলুম, দিন-রাত জেগে পড়েছিলুম, ফল হলো টি. বি.—

তারপর ভদ্রলোকের যেন একটু জ্ঞান হলো।

বললে—আপনি যেন শুনে ভয় পাবেন না। আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলছি না। আপনার ছেলে দৌড়ে ফার্স্ট হোক এই-ই আমি চাই—

হরিবিলাস বললে—আমার ছেলে ফার্স্ট হোক এটা চাওয়া কি বাপের পক্ষে অন্যায়? বলুন?

ভদ্রলোক বললে—তবে শুনুন—একটা গল্প শুনবেন?

হরিবিলাস বললে—বলুন—

হঠাৎ চিৎকার উঠেছে—বাক্ আপ নাম্বার ফোর—বাক্ আপ নাম্বার ফোর—

হরিবিলাস আবার চেয়ে দেখলে রাস্তার দিকে। সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠছে। সবাই একদৃষ্টে নাম্বার ফোরকে দেখছে। নাম্বার ফোরই যেন সকলের আশা মেটাতে পারবে।

—বাক্ আপ টুলু, বাক্ আপ—

আশ্চর্য! তুলালের এক-বয়েসীই হবে ছেলেটা। একটু আগেই তুলাল এই রাস্তা দিয়েই গেছে, কিন্তু তাকে দেখে হরিবিলাসেরই তুঃখ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বলে—আর দৌড়োসনি তুই বাবা, আয়, বাড়ি ফিরে আয়—তুই ওদের সঙ্গে পারবি না—

কিন্তু এই ছেলেটা?

দৌড়চ্ছে না তো, যেন মাটি কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে চলেছে। কী চমৎকার স্বাস্থ্য! মিস্টার মজুমদারও যখন অফিসে ঢোকেন, এই রকম মাটি কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে ঢোকেন। আশপাশের লোক মাথা নিচু করে সেলাম করে। মিস্টার মজুমদারকে সেলাম করে যেন সবাই কৃতার্থ হয়।

আর হরিবিলাস?

হরিবিলাসের নিজের অফিসেই ঢুকতে ঘেন্না করে। চা-ওয়ালা, জুতোসেলাই-এর মুচি, সবাই নির্বিবাদে অফিসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যেন সরকারী রাস্তা।

একবার মজুমদার-সাহেবের কাছে যেতে হয়েছিল হরিবিলাসকে। মজুমদার-সাহেবের কাছে যেতে হলে স্লিপ দিয়ে তবে ঢুকতে পারা যায়।

—আপনার কী চাই?

হরিবিলাস বলেছিল—আমাদের দেশের পৈতৃক জমি নিয়ে একটা দরখাস্ত করেছিলাম, সেই সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে এসেছি—

—দরখাস্ত করেছেন কবে?

হরিবিলাসকে একবার বসতেও বললেন না মজুমদার সাহেব। সেই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হরিবিলাস বললে—প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল—

—এক মাস মাত্র? আমার হেড-ক্লার্কের কাছে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি কী বললেন?

—তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

যেন রেগে গেল মজুমদার সাহেব। সামান্য কাজের জন্যে ল্যাণ্ড-রেজিস্ট্রারের কাছে যাকে-তাকে পাঠানো অন্যায়। হেড-ক্লার্ককে ডেকে পাঠালেন তিনি। বুড়োমানুষ। বেশ চুল পাকিয়ে ফেলেছেন এই অফিসে কাজ করে করে। সামনে এসে সবিনয়ে নিচু হয়ে দাঁড়ালেন।

মজুমদার সাহেব বললেন—এ ভদ্দরলোককে আমার কাছে পাঠিয়েছেন কেন? যাকে-তাকে কেন আমার কাছে পাঠান? এবার থেকে আমার কাছে এমন কেস পাঠাবেন না, আমি বড় বড় কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকি—

বলে হরিবিলাসকে বললেন—আপনি আপনার যা দরকার আমার এই হেড-ক্লার্ককে বলবেন, আমার কাছে আসবার দরকার নেই, যান—

ছোট একটা জমির ব্যাপার। বছরে তিরিশটা টাকাও আসে না সে-জমি থেকে। তবু সেটেলমেণ্ট্-অফিস থেকে চিঠি এসেছিল হরিবিলাসের কাছে। আর সেই কারণেই ল্যাণ্ড রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হয়েছিল নিজের অফিস কামাই করে।

হঠাৎ পাশের ভদ্রলোক বললে—নাম্বার ফোরই দেখছি ফার্স্ট হবে মশাই—

হরিবিলাস বললে—কেন ওরা ফার্স্ট হয় বলুন তো?

—ওরা মানে কারা?

—ওই যারা বড়লোক। এই দেখুন না, আমি এত করে মনে-প্রাণে চাইছিলুম আমার ছেলে ফার্স্ট হোক, আমি ছেলের জন্যে অফিস কামাই করলুম আজকে, অথচ কই, নাম্বার ফোরের বাবা তো এখানে ছেলের রেস্ দেখতে আসেনি—

ভদ্রলোক বললে—আমার গল্পটা তো এখনও আপনাকে বলা হয়নি—

হরিবিলাস বললে—বলুন না—

ভদ্রলোক বললে—আমি তো এম. এ.-তে ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট, তা তো আপনাকে বলেছি, আর আমি যার গলগ্রহ তার কী বিদ্যে তা জানেন?

—বলুন, কী বিদ্যে?

ভদ্রলোক বললে—নন্-ম্যাট্রিক। নন-ম্যাট্রিক বললেও ভুল হবে। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়ে ব্যবসায় ঢোকে আর সেই ব্যবসাতেই আজ সে কোটি টাকার মালিক হয়েছে···

—কিন্তু ব্লাডপ্রেসার? ডায়াবেটিস? বাত?

ভদ্রলোক বললে—না, কিছুই নেই। খুব ভাল স্বাস্থ্য। আমার মত ভোরে উঠে মর্নিং-ওয়াক করতে হয় না। এখনও তিন-পেগ্ হুইস্কি খায় রোজ—

হরিবিলাস বললে—আশ্চর্য তো—

—কেন, আশ্চর্য কেন?

হরিবিলাস বললে—আমারও এক বন্ধু আছে, সে আর আমি একসঙ্গে একই স্কুলে পড়তুম। সে ফেল করে করে লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে দিলে। সিমেণ্ট আর লোহার ব্যবসা। সে এখন কোটিপতি। তিন-চারখানা গাড়ি, বিরাট বাড়ি, ছেলেরাও বেশ মানুষের মত মানুষ। কিন্তু ওই রোগ—

—রোগ মানে? কী রোগ?

হরিবিলাস বললে—ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস, বাত, সমস্ত রকম

রোগে ধরেছে তাকে—ডাক্তার গাড়ি চড়তে বারণ করে দিয়েছে তাকে। বলেছে গাড়ি চড়লেই মুশকিল। ব্লাডপ্রেসার বাড়বে। সে এখন সকাল-বিকেল আমাদের মত পায়ে হেঁটে বেড়ায়—

—তাহলে অত টাকা উপায় করে কী হলো ?

হরিবিলাস বললে—তাই তো ভাবছি—

—ভেবে কিছুই কুল-কিনারা করতে পারবেন না মশাই। ওই যে বললুম জীবনটাই ঘোড়-দৌড়। কেউ এখানে জিতে জেতে, কেউ আবার জিতে হারে। সংসারের হার-জিতের মানদণ্ড আলাদা—

—আলাদা কী-রকম ?

ভদ্রলোক বললে—সেই কথাই তো বলছি—

বলে একটু থামলো। তারপর বলতে লাগলো—এ-জীবনে কত বড়কে ছোট হতে দেখেছি, কত ছোটকেও অনেক বড় হতে দেখেছি, আবার ছোটও নয়, বড়ও নয়, সকলের সঙ্গে একাকার হয়ে থাকতেও কত মানুষকে দেখেছি। আমি নিজে একজন কোটিপতির সঙ্গে দিন-রাত কাটাই, সেই কোটিপতিকেও এখন সব সময় দেখছি। তার সুখও দেখছি, দুঃখও দেখছি। কিন্তু কোনও তফাত পাই না। আমি, যে-আমি বলতে গেলে ভিখিরি, তার তুলনায় ভিখিরিই তো, সেই আমিও যা, আমার সেই বন্ধুও তাই। সে যে আমার চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে তা নয়, আমার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে, তাও নয়। সে যে আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তাও নয়। তবু তার কাছে টাকা হুড়-হুড় করে এসে পড়ে। আমি চেষ্টা করলেও একটা পয়সা উপায় করতে পারি না। আমার হাতে যদি কেউ একটা টাকা দেয়, তো সঙ্গে সঙ্গে সেটা উড়ে যায়—

—কেন এরকম হয় ?

ভদ্রলোক বললে—ওই যে বললুম ঘোড়-দৌড়—জীবনটাই একটা ঘোড়-দৌড়। আমার বন্ধু চেষ্টা করলেও জীবন-যুদ্ধে হেরে যেতে পারবে না—আর আমি হাজার চেষ্টা করলেও জিততে পারবো না—

—তাহলে এর কোনও মানে নেই ? এই জীবনের ?

ভদ্রলোক বললে—এর মানে খোঁজবার চেষ্টা করে আসছে বহু লোক। যুগ যুগ ধরে বৈজ্ঞানিকরা, ঐতিহাসিকরা, ভাবুকরা, মুনি-ঋষিরা কেবল সেই চেষ্টাই করে আসছে, কিন্তু সে-খোঁজা এখনও শেষ হয়নি, খুঁজলেও উত্তর পাবে না—

হরিবিলাস চুপ করে রইলো।

ভদ্রলোক বললে—সেই খোঁজা খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। দেখি কে জেতে—

হরিবিলাস জিজ্ঞেস করলে—কে জিতবে বলে মনে হচ্ছে আপনার ? কত নম্বর ?

ভদ্রলোক হাসলো। বললো—ওভাবে জীবনের মানে খুঁজতে যাবেন না—জীবন অত সহজ নয়—

—কিন্তু আমি আমার ছেলের জন্যে ভাবছি। আমার ছেলে কি জিততে পারবে ?

হঠাৎ আবার নাম্বার ফোর ঘুরে এসেছে।

চিৎকার উঠলো চারিদিক থেকে—বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর—বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর—

সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল হরিবিলাসের চোখের সামনে—

হরিবিলাস আর চেয়ে দেখতে পারলে না। মনে হলো যেন পৃথিবীটাই চোখের সামনে ঘুরতে আরম্ভ করেছে—

ভাগবত হালদারমশাই মহাবীর সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট। তিনিও জীবনে অনেক দিন থেকেই ফার্স্ট হতে চেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তারপর ভাগ্যের জুয়া-খেলায় অভাবনীয় উন্নতি করেছেন জীবনে। মানুষ যা-কিছু চায় তা করেছেন। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ। কিছুরই অভাব নেই তাঁর।

কিন্তু সব পেয়েও মনে হয়েছিল যেন কিছুই তিনি হতে পারেননি।

মনে হয়েছিল তিনি যেন হেরে গেছেন, তাঁর ফার্স্ট হওয়া হয়নি জীবনে।

তখন তিনি আবার নেমেছেন দৌড়ে।

মহাবীর সঙ্ঘের ছেলেরা যে দৌড়চ্ছে, এ যেন তিনি নিজেই তাদের সঙ্গে দৌড়চ্ছেন। তাঁকে ফার্স্ট হতে হবে। তাঁকে সকলের সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি এম. এল. এ. হয়েছেন, এবার তাঁকে মিনিস্টার হতে হবে। একবার মিনিস্টার হতে পারলে তখন হবেন চীফ-মিনিস্টার—

ভোরবেলাই তিনি আসতে চাইছিলেন।

কিন্তু সেক্রেটারি বিপিন সরকার তাঁকে আসতে দেয়নি।

বিপিন সরকার বলেছিল—আপনি কেন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবেন স্যার? আমরা তো আছি—

কিন্তু দেরি করে এলেও খবর সব রাখছিলেন। সব ব্যবস্থা ঠিক মত চলছে কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। মহাবীর সঙ্ঘের দৌড় তো নয়, এ যেন তাঁরই দৌড়।

গাড়িটা নিয়ে ক্লাবে আসতেই শুনলেন সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বিপিন সরকার দৌড়ে কাছে এল।

বললে—সব ঠিক চলছিল স্যার, একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে শুধু—

—কী গণ্ডগোল?

—একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

—মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে? কী-রকম?

বিপিন সরকার বললে—না, তেমন কিছু ভয়ের ব্যাপার নেই, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ফোন করে এ্যাম্‌বুলেন্স আনিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, কোনও ভয়ের কারণ নেই—

ভাগবত হালদার জিজ্ঞেস করলেন—অন্য সবাই দৌড়চ্ছে তো?

—না স্যার, অনেকেই থেমে গেছে।

—ক'জন থেমে গেছে ?

—পাঁচ-ছ'জন। বারোজনের মধ্যে একজনের তো এ্যাকসিডেণ্ট, আর পাঁচ জন থেমে গেছে—

—আর বাকি রইল ক'জন ?

—বাকি আছে ছ'জন। ছ'জনের মধ্যে এখন রেস্ চলছে, দেখি কী হয়—

ভাগবত হালদার বললেন—দেখো, যেন পণ্ড না হয়, আমার তো রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি কাল!

—কেন ?

বিপিন সরকার বললে—কেন ঘুম হলো না? আমি তো আপনাকে বলেই রেখেছিলুম আপনি কিছু ভাববেন না—

ভাগবত হালদার বললেন—তুমি বললেই তো আর হবে না, এত বড় দায়িত্ব আমার, আর আমি ঘুমোব ?

বিপিন সরকার বললে—আপনি এই চেয়ারটাতে একটু বসুন স্যার, আমি ও-দিকটা একবার দেখে আসি—

—আমি চুপ করে বসে থাকতে পারবো না বিপিন, আমি ধড়ফড় করবো। আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

—না না, আপনি শুধু শুধু গিয়ে কী করবেন!

ভাগবত হালদার জিজ্ঞেস করলেন—ঠিক সময়ে রেস্ আরম্ভ হয়েছিল তো ?

—হ্যাঁ, সেদিক থেকে কোনও ত্রুটি হয়নি।

—আর কতক্ষণ বাকি ?

—এই এবার হয়ে এল—আর একটা রাউণ্ড্।

দুলালের মনে হলো সে যেন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছে। আর বেশি দেরি নেই। কে ফার্স্ট হচ্ছে, তারও খেয়াল

নেই। গোবিন্দ আঢ্যি রোড পেরিয়ে যেতেই নাম্বার এইট্ তাকে টপকে আরো দূরে এগিয়ে গেল।

পেছন ফিরে একবার চেয়ে দেখলে দুলাল।

পেছনে আসছে নাম্বার ফোর।

দুলাল আরো জোরে পা বাড়িয়ে দিলে। আরো জোরে। আর দুটো রাউণ্ড্ দিলেই শেষ। দু'জনকে টপকাতে হবে, তবে তো ফার্স্ট হতে পারবে সে—

মণিময়ের বাড়ির কাছটায় আসতেই একবার চেয়ে দেখলে। এইখানটাতেই করাত-কলটা ছিল। করাত-কলের কারখানা। মণিময় মরে যাবার পরই করাত-কলটা ওখান থেকে সরিয়ে দিলে পুলিস। পাড়ার মধ্যে করাত-কল রাখা চলবে না।

হঠাৎ জায়গাটার কাছে যেতেই বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। যেন তার সামনে দিয়ে মণিময় ছুটে ছুটে চলেছে। ঠিক তার আগে আগে ছুটেছে।

মণিময় ছুটছে আর তাকে ডাকছে।

বলছে—আয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে আয় দুলাল—আমার সঙ্গে এলে আমি তোকে ফার্স্ট করে দেবো।

সত্যিই, মণিময়ই ফার্স্ট হয়ে গেল জীবনে। ইস্কুলে সে ফার্স্ট হয়েছে। মরে গিয়েও সে ফার্স্ট হলো। ফার্স্ট হতে না পারলে বোধহয় দৌড়নো উচিত নয়।

মণিময় বলতো—জানিস, আমি বড় হয়ে বাবার মত উকিল হবো না।

—কেন, উকিল হলে অনেক টাকা উপায় হয়, অনেক তো টাকা হয়।

মণিময় বলতো—না, বাবা বলে আমাকে ডাক্তারী পড়াবে। ডাক্তারী পড়লে লোকের অনেক উপকার করা যায়।

—কেন, উকিল হলেও তো অনেকের উপকার করা যায়?

মণিময় বললে—না, বাবা বলেছে, মিথ্যে কথা না বললে উকিলের পসার হয় না। বাবার তাই খুব কষ্ট হয়। মিথ্যে কথা বলতে পারলে বাবা আরো পয়সা উপায় করতে পারতো।

তুলাল বলতো—আমার বাবা বলে—সৎপথে থাকাই ভালো।

মণিময় বলতো—তুই মিছিমিছি ভাবছিস, ভগবান মানুষকে যে-পথে নিয়ে যাবে, মানুষ কেবল সেই পথে যাবে। তার অন্য কোনও পথ নেই।

—তুই ভগবান বিশ্বাস করিস ?

মণিময় বলতো—আমি ভগবান দেখেছি।

—কী রকম দেখতে রে ?

—খুব ভালো। সুন্দর চেহারা।

—তুই কী করে দেখলি ?

মণিময় বললে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখেছি।

তুলাল বললে—কিন্তু স্বপ্ন তো মিথ্যে···

মণিময় বললে—স্বপ্ন মিথ্যে বটে, কিন্তু সব স্বপ্ন মিথ্যে নয়। পৃথিবীর বড় বড় লোকরা যে-স্বপ্ন দেখে তা সত্যি। গান্ধী স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, তা হয়েছে।

কত সব কথা, কত সব স্মৃতি। সব কি ঠিক এই সময়ে মনে আসতে হয়! এই সময়ে যে কেন এ-সব মনে আসে কে জানে!

বাবা বলে—তুমি বড় অন্যমনস্ক। অত অন্যমনস্ক হলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। যেটা করবে একমনে করবে, অন্য দিকে মোটে মন দেবে না।

তুলাল বাবার কথার প্রতিবাদ করেনি কখনও। বাবার কথাগুলো মন দিয়ে বরাবর শুনতো। কিন্তু কিছুতেই একমনে সব কাজ করতে পারতো না। পড়তে বসে কেবল খেলার কথা মনে আসে, খেলতে গিয়ে মণিময়ের কথা মনে পড়ে।

মা একবার খুব বকেছিল।

বলেছিল—খাবার সময় কী অত ভাবছিস রে? ফের যদি অন্য কথা ভাবিস তো দেখবি—

দুলাল বলেছিল—আমি কিছু ভাবিনি মা।

—অন্য কিছু ভাবিসনি তো পাতে ভাত পড়ে রইলো কেন তোর?

—আর ক্ষিধে নেই মা।···

হঠাৎ নাম্বার ফোর তার ঘাড়ের কাছ দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। নাম্বার ফোর। টুলু। বেকার রোডে থাকে সে।

—বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর, বাক্ আপ্ নাম্বার ফোর!

সবাই নাম্বার ফোরকে দেখলেই উৎসাহ দিচ্ছে।

কিন্তু কেন? নাম্বার ফোরকেই বা সবাই উৎসাহ দেয় কেন? আরো তো কত নম্বর রয়েছে। আরো কত ছেলে দৌড়চ্ছে!

এক-একজন মানুষ ওই রকম ভাগ্য নিয়েই জন্মায় হয়তো।

অথচ দুলাল? ছোটবেলা থেকেই নিরুৎসাহ পেয়ে এসেছে দুলাল। ছোটবেলা থেকেই যেন ধরেই নিয়েছে সবাই যে, দুলালের কিছু হবে না। দুলালের কিছু হবে না শুনতে শুনতে দুলালের কান পচে গেছে। এবার সে দেখিয়ে দেবে দুলালও কিছু হতে পারে।

যদুবাবু বলতেন—তোর কিছ্ছু হবে না।

শুধু যদুবাবু কেন, সবাই।

সবাই-ই বলেছে—দুলালের দ্বারা কিছ্ছু হবে না।

হয়তো এক-একজন ছেলে ওই কপাল নিয়েই জন্মেছে, তাদের দেখেই সবাই রায় দিয়ে দেয় যে, তাদের দ্বারা কিছু হবে না।

কেন এমন হয়? এর জন্যে কে দায়ী? সে তো টুলুর মতই মন দিয়ে পড়ে। টুলুর চেয়েও বেশি মন দিয়ে লেখাপড়া করে। তা'হলে কেন সে ফার্স্ট হতে পারে না? স্কুলের মাস্টাররা যখন পড়ায় তখন সবাই টুলুর দিকে চেয়ে চেয়ে কেন পড়ায়?

কই, দুলালের দিকে তো কেউ ফিরেও চায় না।

অথচ দুলালও তো টুলুর মত মাইনে দেয়। বাবা তার মাইনে একদিনের জন্যেও ফেলে রাখে না। ঠিক নিয়ম করে মাইনে দেও নিয়ম বাবার।

বাবা বলে—মাইনে দিতে একদিনও দেরি করবে না, আমি যদি ভুলেও যাই তো তুমি আমাকে মনে করিয়ে দেবে, বুঝলে?

আবার নাম্বার এইট্ আসছে। নাম্বার এইট্—নাম্বার এইট্—সবাই নাম্বার এইট্‌কে উৎসাহ দিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

দু'জন তখন দৌড়চ্ছে।

কেউ কোথাও নেই নাম্বার টুয়েলভ্‌কে উৎসাহ দিতে। কেউ নেই তার। একবার শুধু বাবাকে দেখেছিল। বাবার মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল যেন দুলালের জন্যে খুব ভাবছে। দুলালকে দেখবে বলেই যেন দাঁড়িয়ে ছিল বাবা।

আশপাশের যত লোক সবাই চুপ করে আছে। শুধু বাবা একলা তার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে।

—দৌড়োও, দৌড়োও খোকা, দৌড়োও, আরো জোরে দৌড়োও—

বাবাকে দেখেই দুলালের বুকখানা দশহাত হয়ে উঠলো। আরো জোরে ছুটতে শুরু করলো দুলাল। একটুখানি উৎসাহ, এক ছিটে মুখের হাসি, ওতেই যথেষ্ট। ওইতেই যেন দশটা ঘোড়ার শক্তি এসে গেল দুলালের বুকে। মনে হলো আর কেউ না থাক, বাবা তো আছে, বাবা তো তাকে দেখছে।

বাবার কথাগুলো যেন দুলালের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

গোবিন্দ আঢ্যি রোড পেরিয়ে সেন্ট্রাল রোড। সেন্ট্রাল রোডটা পেরিয়ে পিয়ারি মোহন রায় রোড। পিয়ারি মোহন রায় রোড পেরিয়ে শঙ্কর বোস রোড।

শঙ্কর বোস রোডে পৌঁছলেই শেষ। রেস শেষ হয়ে যাবে।

দুলাল আরো জোরে পা বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে হুইশল্ বেজে উঠলো।

সমস্ত পাড়াটার মধ্যে একটা শোরগোল উঠলো। একটা হুইশল্ বাজতেই ওদিক থেকে আর একটা হুইশল্ বেজে উঠলো।

হুইশল্ বাজা মানেই—সাবধান।

একটা কিছু বিপদ হয়েছে কোথাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল যারা তারাও উসখুস করতে লাগলো। কী হলো, কোথায় কী হলো? কেউ উন্‌ডেড্ হলো নাকি?

দু'একজন বলে উঠলো—ওরে, ওদিকে একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে—

—এ্যাক্‌সিডেণ্ট? কীসের এ্যাক্‌সিডেণ্ট?

—একজন মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেছে—

—কে পড়ে গেছে? কত নম্বর?

কেউ জানে না কত নম্বর। কিন্তু এ্যাক্‌সিডেণ্ট একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। চলো, চলো দেখতে যাই।

যে ভদ্রলোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে হরিবিলাসের সঙ্গে কথা বলছিল, সে হেসে উঠলো।

বললে—জানেন, এ্যাক্‌সিডেণ্ট একবার আমারও হয়েছিল—

—আপনার? এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, আমারও বিয়ে হয়েছিল।

—কেন, বিয়ে হওয়াটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট বলছেন কেন?

—এ্যাক্‌সিডেণ্ট নয়? আমার মত লোকের পক্ষে বিয়েটাই তো আসল এ্যাক্‌সিডেণ্ট!

—আপনার স্ত্রী এখন কোথায়?

—নেই।

হরিবিলাস অবাক হয়ে গেল শুনে। বললে—মারা গেছেন বুঝি?

—না, পালিয়ে গেছে।

হরিবিলাস এতক্ষণে ভালো করে চেয়ে দেখলে ভদ্রলোকের দিকে। কেমন যেন অবাক লাগলো। মনে হলো যেন তাজমহল দেখছে। স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার পরও এমন করে ভদ্রলোক হাসতে পারে! কল্যাণী মারা যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না হরিবিলাস। কল্যাণীই যদি না থাকে তো হরিবিলাস কী নিয়ে বাঁচবে?

কল্যাণী বড় পরিশ্রম করে। সামান্য গরীবের সংসার। এমন কিছু সুখ দিতে পারেনি স্ত্রীকে হরিবিলাস। লোকে অন্ততঃ একটা-দুটো গয়না দেয়। মেয়েমানুষ গয়না পেলে খুশী হয়!

একবার হরিবিলাস দুঃখ করে বলেছিল—তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি, অন্য কোনও লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার ভালো হতো—

কল্যাণী রাগেনি। শুধু হেসে বলেছিল—আর আদিখ্যেতা করতে হবে না তোমায়—

হরিবিলাস বলেছিল—না না, আমি সত্যি কথাই বলছি—

—তোমাকে আর সত্যি কথা বলতে হবে না গো, খুব হয়েছে। তুমি একটু নিজের কথা ভাবো তো। দিন-দিন তোমার শরীরটার কী দশা হচ্ছে সেই কথাটা একবার ভাবো দিকিনি। তোমাকে একটু ভালো খেতে দিতে পারছি না—এ কি আমার কম দুঃখু—

কথাগুলো শুনতে ভালো লেগেছিল হরিবিলাসের। কল্যাণী যদি না থাকতো তো দুলাল কি মানুষ হতো! দুলাল যে মানুষ হয়েছে এ তো কল্যাণীর জন্যেই। অল্প-টাকায় কত ভালো করে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কল্যাণী, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা দিন মুখ-ভার নেই, একটা কিছু শখের জিনিস চাওয়া নেই। সব দুঃখ-কষ্ট মুখ বুজে হাসিমুখে সহ্য করে চলেছে। এ কার জন্যে? সংসারের জন্যে?

অথচ সংসার বলতে কী? সংসার বলতে কতটুকু? হরিবিলাসের সংসার বলতে শুধু তো ওই দুলাল। ওই দুলালের মুখ চেয়েই দু'জনে সবকিছু সহ্য করে চলেছে।

দুলাল বড় হবে, দুলাল মানুষ হবে। দুলাল বড় হলে সকলে তার প্রশংসা করবে। তার বেশি চাইবার আর কী আছে? আর তো কিছু চাইবারও নেই এখন।

এই যে হরিবিলাস অফিস কামাই করে আজ এখানে এই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই-ই বা কেন? কীসের জন্যে, হরিবিলাস যদি এখানে না থাকে তো দুলাল কি হেরে যাবে?

অথচ ওই নাম্বার ফোর? টুলু মজুমদার?

টুলু মজুমদারের বাবা তো কই এখানে এসে দাঁড়ায়নি! তিনি তো তাঁর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর ছেলে ফার্স্ট হলো কি লাস্ট হলো তা দেখবার দায় তো তাঁর নেই।

কেন নেই? মজুমদার সাহেব কি তাঁর ছেলেকে হরিবিলাসের চেয়ে কম ভালবাসেন?

হঠাৎ ওদিক থেকে নাম্বার এইট্ সামনে এসেছে—

—বাক্ আপ্ নাম্বার এইট্—বাক্ আপ্—

দেখে মনে হলো নাম্বার এইট্ যেন হাঁপাচ্ছে খুব। আর পারছে না।

হরিবিলাস ভালো করে দেখতে লাগলো নাম্বার এইট্কে। দুলালের চেয়ে বোধহয় কিছু বড়ই হবে। কিন্তু দেখেই বোঝা যায় গরীবের ছেলে।

হরিবিলাসের বড় ভালো লাগলো।

গরীবের ছেলেকেও তাহলে সবাই উৎসাহ দেয়! কিন্তু এদের মধ্যে দুলালকে তো কই কেউ 'বাক্ আপ্' করছে না। দুলাল কি ভালো করে লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না? দুলালের কি কোনও বন্ধু নেই? দুলালও কি ঠিক হরিবিলাসের মতই হয়েছে?

না না, দুলালকে কারোর সঙ্গে মিশতে না দিয়ে খারাপ হয়েছে। দুলালকে কারো সঙ্গে আড্ডা দিতে বারণ করেও খারাপ হয়েছে।

আজকে বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে কল্যাণীকে।

বলতে হবে যে, দুলালের কোনও বন্ধু নেই—

কল্যাণী হয়তো বলবে—কারোর সঙ্গে না-মেশাই তো ভালো গো। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশলে দুলাল যে আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে—

হরিবিলাস বললে—কিন্তু একটাও যে বন্ধু নেই ওর! ও যখন দৌড়চ্ছিল তখন কেউ ওকে উৎসাহ দিচ্ছিল না, কেউ চাইছিল না যে ও জেতে—

কল্যাণী হয়তো বিশ্বাস করবে না কথাটা। হয়তো ভাববে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে।

হরিবিলাস বললে—না না, বিশ্বাস করো তুমি, আমি নিজের চোখে যে সব দেখলুম। মজুমদার সাহেবের ছেলে যখন দৌড়চ্ছিল তখন সবাই বলছিল সে ফার্স্ট হবে। সবাই মনে মনে চাইছিল যেন মজুমদার সাহেবের ছেলেই ফার্স্ট হয়—

কল্যাণী বলবে—সেও বড়লোকের ছেলে বলে—

—না গো, শুধু টুলু নয়, নাম্বর এইট্ যখন দৌড়োচ্ছিল তখনও সবাই 'বাক্ আপ্' বলে চেঁচাচ্ছিল, হাততালি দিচ্ছিল—কিন্তু দুলালের বেলাতে কেউ হাততালি দেয়নি—

কথাটা শুনে কল্যাণী হয়তো মনে কষ্ট পাবে। হয়তো ভাববে হরিবিলাস ভুল দেখেছে। কিন্তু কল্যাণী যদি নিজে আসতো এখানে তো দেখে যেতো—

—কী হে, হরিবিলাস? কী ব্যাপার?

হঠাৎ মুখ ফেরাতেই হরিবিলাস দেখলে—পঙ্কজ চাটুজ্যে।

পঙ্কজ বললে—অফিসে যাওনি?

হরিবিলাস বললে—এই ভাই এদের রেস দেখছি—

—রেস? রেস দেখে কী করবে?

হরিবিলাস বললে—এই ভাই আমার ছেলে দৌড়ুচ্ছে কি না—

—তোমার ছেলে? দৌড়চ্ছে? কত নম্বর?

হরিবিলাস বললে—বারো। নাম্বার টুয়েল্‌ভ্‌।

—ভালো, ভালো। বড় রোগা চেহারা। খুব হাঁফিয়ে পড়েছে মনে হলো। আমি তো মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছিলুম, তাই গোড়া থেকেই দেখে আসছি—

—তোমার ছেলেরা কেউ দৌড়চ্ছে নাকি?

পঙ্কজ বললে—না ভাই, আমার ছেলেরা সব বড় বড় হয়ে গেছে; সব দোকানে যায় এখন—

হরিবিলাস জিজ্ঞেস করলে—আমার ছেলেকে কেমন দেখলে ভাই, পারবে? নাম্বার টুয়েল্‌ভ্‌?

পঙ্কজ বললে—দেখেছি, তোমার ছেলে ভাই বড্ড রোগা, একটু দুধ-টুধ খেতে দাও না কেন? একটু প্রোটিন খেতে দিতে হয়, তবে তো গায়ে শক্তি হবে—

হরিবিলাসের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

একবার মনে হলো বলে—তুমি তো ভাই অনেক প্রোটিন খেয়েছো, তোমার এমন ডায়াবেটিস হলো কেন?

কিন্তু কিছু বললে না মুখে। অপ্রিয় কথা কখনও বলা অভ্যেস নেই হরিবিলাসের। অপ্রিয় কথা শুনতে কারো ভালো লাগে না। অপ্রিয় কথা বললেই মানুষ শত্রু হয়ে যায়।

পঙ্কজদের সঙ্গে কথা বলতে আর ভালো লাগলো না হরিবিলাসের।

পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—উনি কে? ওই যে প্রোটিনের কথা বলছিলেন?

হরিবিলাস বললে—আমার ছোটবেলার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড্‌—

—খুব বড়লোক বুঝি?

হরিবিলাস বললে—হ্যাঁ, কোটিপতি, লোহা আর সিমেন্টের ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে—অথচ লেখাপড়া ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত—

—বুঝতে পেরেছি, ওঁর কথা শুনেই তা বুঝতে পেরেছি।

হরিবিলাস বললে—অথচ দেখুন, আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো ছেলে, লেখাপড়ায় ইস্কুলে আমি ফার্স্ট হতুম, কলেজে আমি ইংরিজীতে আর সংস্কৃততে লেটার পেয়েছি, আমি আড়াইশো টাকা মাইনে আর পঁচাত্তর টাকা ডিয়ারনেস্ অ্যালাওয়েন্স পাই—

—তা'হলে শুনুন।

বলে ভদ্রলোক বললে—আপনাকে তো বলেছিলুম আমিও এম্. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছিলুম—

—হ্যাঁ, আপনি তো বলেছিলেন।

—শুনুন, তার পরের ঘটনাটা বলি। আমি একটা চাকরি পেলুম। ভালো চাকরি। দেড়-হাজার টাকা মাইনে। সাতশো টাকাতে স্টার্ট করে শেষকালে দেড়-হাজার টাকাতে উঠলুম।

—তারপর ?

—তারপর একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়েও হলো।

—তারপর ?

ভদ্রলোক হাসতে লাগলো আবার। বেশ মোলায়েম হাসি।

বললে—বিয়ে করার দু'বছর পরেই আমার স্ত্রী পালিয়ে গেল আমাকে ছেড়ে—

—সে কী ? কেন ?

ভদ্রলোক বললে—সেই কথাই তো বলছি। এই ছেলেদের দৌড়নো দেখছিলাম আর তাই ভাবছিলাম। আমার তো জীবনের দৌড়ে জেতারই কথা। কিন্তু আমি হেরে গেলাম।

—কেন ?

ভদ্রলোক বললে—আমার স্ত্রী একদিন আমার গাড়ির মুসলমান ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

হরিবিলাস স্তম্ভিত হয়ে গেল ভদ্রলোকের কথায়।

মুখ দিয়ে একটা কথাও আর বেরোল না।

—আপনি কী করলেন তারপর ?

ভদ্রলোক বললেন—কিছুই করিনি—

—মামলা করলেন না কেন ? পুলিসে খবর দিলেন না কেন ?

—কার নামে মামলা করবো ?

—কেন, সেই মুসলমান ড্রাইভারের নামে ?

ভদ্রলোক বললে—না মশাই, অত বোকা আমি নই। আমি ঘেন্নায় চাকরি ছেড়ে দিলুম। দিয়ে এখন তিরিশ বছর আমার বড়-লোক বন্ধুর অন্নদাস হয়ে আছি। একটা জুতো কেনার দরকার হলেও তার কাছে হাত পাততে হয় আমাকে —

হরিবিলাস কী আর বলবে, শুধু চুপ করে রইলো।

হঠাৎ চারদিক থেকে হৈ-হৈ শব্দ উঠলো।

হরিবিলাস কিছু বুঝতে পারলে না। এত শব্দ, এত চিৎকার কীসের ? এত আনন্দ কার জন্যে ?

—নাম্বার ফোর ফার্স্ট হয়েছে, নাম্বার ফোর ফার্স্ট হয়েছে···

নাম্বার ফোর ফার্স্ট হয়েছে ?

হরিবিলাসের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—আর নাম্বার টুয়েল্ভ্ ? নাম্বার টুয়েল্ভ্ কত হলো বলতে পারেন মশাই ?

—কী জানি, বলতে পারি না।

—সেকেণ্ড কে হলো ?

—নাম্বার এইট্!

হরিবিলাস যেন মুষড়ে পড়লো। ফার্স্ট হওয়া দূরে থাক, সেকেণ্ডও হতে পারলো না দুলাল!

—থার্ড কে ?

লোকটা বললে—ঠিক জানি না। ওইদিকে যান-না। ওই শঙ্কর বোস রোডে। ওখানে রেজাল্ট জানিয়ে দিচ্ছে।

হরিবিলাস ভদ্রলোককে বললে—চলুন, শঙ্কর বোস রোডের দিকে

যাই, আমার ছেলের কী হলো জেনে আসি। ফার্স্ট সেকেণ্ড কিছুই হয়নি—দেখি অন্ততঃ থার্ড হতে পেরেছে কিনা—

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে শঙ্কর বোস রোডের কাছে আসতেই দেখা গেল সেখানে একটা এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক বললে—অ্যাক্সিডেণ্টের কথা সবাই বলছিল, ওই অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে বোধহয় একটা—

হরিবিলাস মনে মনে ভাবলে—তুলালের কোনও অ্যাক্সিডেণ্ট হয়নি তো? হে ভগবান, তুলালের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, তুলাল যেন সুস্থ থাকে। তুলাল আমার এক ছেলে। তুলাল ফার্স্ট না হোক, সেকেণ্ড না হোক, থার্ডও না হোক, কিছু ক্ষতি নেই, সে যেন শুধু বেঁচে থাকে ভগবান। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না। আমরা গরীব লোক, আমরা মিস্টার মজুমদারের মত বড়লোক নই, পঙ্কজ চাটুজ্যের মত আমরা ছেলেদের প্রোটিন খেতে দিতে পারি না। শুধু তোমার কাছে এইটুকু প্রার্থনা, যেন সে বেঁচে থাকে।

কিন্তু মানুষের ঈশ্বর বোধহয় বড় বড় লোকেরই ঈশ্বর। ঈশ্বর বোধহয় তাদেরই একচেটে।

ওদিকে টুলুকে তখন ফুলের মালা পরাবার ধুম পড়ে গেছে। সেই দিকেই বেশি লোকের ভিড়। তারা টুলুর ফোটো তুলবে, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফাররা এসেছে। ভাগবত হালদার মশাই তাদের অনেক টাকা খরচ করে ডাকিয়ে এনেছেন। তারা ফোটো তুলে সে-ছবি কাল খবরের কাগজে ছাপাবে।

—এ কি হরিবিলাসবাবু, আপনি কোথায় ছিলেন? আপনাকে খুঁজতে যে ওদিকে আপনার বাড়িতে লোক গেছে মশাই।

—কেন? কী জন্যে? তুলালের কিছু হয়েছে?

—হ্যাঁ, পিয়ারি মোহন রায় রোড়ে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে তুলাল। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনা হয়েছে, এখুনি তুলালকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গার্জেন হিসেবে আপনিও ওর সঙ্গে যান।

মাথার ওপর বজ্রাঘাত পড়ার কথাটা বইতে লেখা থাকে। কিন্তু সে-জিনিসটা যে কী তা এই-ই প্রথম জানতে পারলো হরিবিলাস।

অ্যাম্বুলেন্সের কাছে গিয়ে ঢুকলো হরিবিলাস।

কিন্তু ঢুকেই সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। দুলাল রাস্তার ওপর পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে—

হরিবিলাস দু'হাতে নিজের চোখ-মুখ ঢেকে ফেললে।

—শুনুন।

ভদ্রলোক আবার বললে—কাঁদছেন কেন মশাই, শুনুন, আপনি যে হাসালেন দেখছি—

কিন্তু হরিবিলাস যেন তখন আর সশরীরে জীবিত নেই। তার কানে যেন আর কোনও কথাই ঢুকছে না। কিন্তু কে তাকে বোঝাবে যে জন্ম-মৃত্যু-আশা-হতাশা-পাপ-পুণ্য-প্রেম-পরিণয় ইত্যাদি নিয়েই মানুষের জীবন। এ-জীবনের রহস্য উন্মোচনের জন্যে কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উপন্যাস-গল্প লেখা হয়েছে, তবু কোনও কিনারা হয়নি এই রহস্যের। রহস্যই এই জীবনের আকর্ষণ, আবার রহস্যই এই জীবনের অশান্তি। এই রহস্য থাকবে, অথচ এই রহস্য উন্মোচনের জন্যে মানুষ যুগ যুগ ধরে তপস্যাও করে যাবে। মানুষের এই-ই বিধিলিপি।

এই রহস্য উন্মোচনের জন্যেই ক্যাম্পবেল সাহেবরা মুমতাজ বাঈদের জন্যে উন্মাদ হয়ে বেঘোরে প্রাণ দেবে, সুশান্ত সান্যালরা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর হরিবিলাসরা নিজেরা ফার্স্ট হতে পারেনি বলে দুলালদের দিয়ে দৌড় করাবে।

কে তাকে বোঝাবে যে ঠিক তার মতই আদিযুগের মানুষ সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে জীবনের রহস্য ভেদ করতে চেয়েছে। সেই রহস্য ভেদ করবার জন্যেই বার বার প্রশ্ন করে গেছে—তোমরা কারা?

ক্যাম্পবেল সাহেবই হোক, সুশান্ত সান্যালই হোক আর হরিবিলাসই হোক, প্রশ্ন করবার লোকের কোনও দিনই অভাব হয়নি। অভাব হয়েছে উত্তরদাতার। ক্যাম্পবেল সাহেব, সুশান্ত সান্যাল আর হরিবিলাসের মত হাজার হাজার মানুষ এই প্রশ্ন সমাধানের জন্যে হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গ করে গেছে। তাল-পাতার পুঁথি ভর্তি করে রেখে গেছে তাদের প্রশ্নাবলি। কেউ উত্তর পেয়েছে, কেউ বা উত্তর পায়নি। নিজের নিজের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে তাদের উপলব্ধির কথা লিখে গেছে। অথচ সেই সুদূর অতীত কাল থেকে এই আজ পর্যন্ত সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর চলে আসছে। একই উত্তরের বিভিন্ন রকম-ফের। কারো বাণীই পূর্ণ সত্য নয়, আবার কারো বাণীই পূর্ণ মিথ্যে নয়। কেউ বলেছে—আমি তাঁকে জেনেছি। আবার কেউ বলেছে—আমি তাঁকে জানতে পারিনি। কেউ বলেছে—তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। আবার কেউ বলেছে—তিনি স্পষ্ট, তিনি প্রত্যক্ষ, তিনি মানুষ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ঈশ্বর মানুষ হয়েছিলেন, আবার মানুষ ঈশ্বর হবে।

পেছন থেকে সেই ভদ্রলোক ডাকলে—শুনুন, অত হতাশ হবেন না। জীবনে ফার্স্ট হতে যারা চায় তাদের এ-রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়। এতে ভয় পাবেন না। আপনার ছেলে সেরে উঠবে একদিন, তখন আবার দৌড়বে। আপনি হতাশ হবেন না—

কথাগুলো যেন ভালো করে কানে গেল না হরিবিলাসের।

কথাগুলো বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। পাশের এক ভদ্রলোক হঠাৎ কাছে এল। বললে—আপনি ও-ভদ্রলোককে চেনেন? হরিবিলাসের তখন ও-সব কথায় মন দেবার সময় নেই। বললে—না। কেন?

ভদ্রলোক বললে—আপনি নাসিম বানুর নাম শুনেছেন ?

হরিবিলাস অস্পষ্ট গলায় শুধু বললে—না—

—আপনি হয়তো সিনেমা দেখেন না তাই মেহের বানুর নাম শোনেন নি। বোম্বাই-সিনেমার সে ছিল একজন বিখ্যাত ফিল্ম-স্টার, এখন তার মেয়েও ফেমাস্ স্টার হয়েছে, এখন ছবি-পিছু সেই মেয়ের রেট তিন লাখ টাকা। বুঝেছেন ? সে-ই ও-ভদ্রলোকের বউ। মুসলমান হয়ে সে এখন সিনেমা করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে। জীবনে সে ফার্স্ট হয়েছে, আর ওই ভদ্রলোক তার স্বামী হয়ে হেরে গিয়েছে—লাস্ট হয়েছে—

হরিবিলাসের কানে কথাটা ঢুকলো কি ঢুকলো না বোঝা গেল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলো যে, দুলাল ফার্স্ট হতে পারেনি, সেকেণ্ড হতে পারেনি, থার্ডও হতে পারেনি। একেবারে লাস্ট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সে এ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে গিয়ে উঠলো।

—